International Journal of Multidisciplinary Research and Development

IJMRD 2015; 2(3): 524-538
www.allsubjectjournal.com
Impact factor: 3.672
Received: 05-03-2015
Accepted: 23-03-2015
E-ISSN: 2349-4182
P-ISSN: 2349-5979

Rumpa Bhadra
ফন্টের নাম:- ঝঁঃড়হহুগল
ফন্টের সাইজ:- ১৪
টাইপ করা হয়েছে:- মাইক্রোসফ্ট্ ওয়ার্ড-এ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্বাচিতছোটগল্পের রূপরেখা

রুম্পা ভদ্র

Rumpa Bhadra

সাহিত্য বলতে কি বুঝি- এ প্রশ্নের উত্তর এককথায় দেওয়া সম্ভব নয়| খুব সংকীর্ণ অর্থে বলা যায় যে, ভাষার মাধ্যমে জীবনের অভিব্যক্তিরই আর এক নাম সাহিত্য| ডাক্তারি বা আইন বিষয় হোক, কিংবা স্থাপত্যবিদ্যা সম্পর্কে বা বিজ্ঞান বিষয়ক যে কোনো আলোচনা, আবার শুধুমাত্র মন ও মননের কারবার যেখানে- যা পড়ে পাঠক ও রচনাকারের মনের উত্তাপ খুঁজে পাই তা সবই সাহিত্যের অঙ্গ| সাহিত্যে এক হৃদয়ের সঙ্গে অন্য হৃদয়ের মেলবন্ধন ঘটে| লেখক তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতাই বর্ণনা করে চলেন সাহিত্যে| আসলে সাহিত্য সম্বন্ধে এই উক্তিটি বোধহয় প্রণিধানযোগ্য- 'কী নয় সেটা বলা সহজ, কী তা জানানোর চেয়ে|'

কোনো জাতিকে জানার জন্য শুধু তার ইতিহাস জানলেই চলবে না| জাতির সামগ্রিক উত্থান পতনের ইতিহাসের রূপ আমরা পাই সাহিত্যের মধ্যে, সাহিত্যে বর্ণিত চরিত্র, ঘটনা, চরিত্রের যে অভিব্যক্তি, সমাজ জীবনের রূপ ইত্যাদিতে বর্ণিত বিষয়ে কল্পনার আধিক্য থাকলেও তা বাস্ত্মব থেকে দুরবর্তী স্থানে বাস নয়| কারণ উদ্ভট কাল্পনিকতার ধোঁয়া সাহিত্যে অচল| যা ঘটমান- তারই সমান্ত্মরাল প্রতিচ্ছবির প্রতিফলন নিয়ে সাহিত্য সাহিত্যিকে ইতিহাসের ধারক ও বাহক বলা হয়|

সাহিত্যকে বুঝতে গেলে সর্বাগ্রে সাহিত্যের বিবিধ আন্দোলনের কথা অবশ্যই জানা দরকার| যেমন- অবক্ষয়বাদ (উবপধফবহঃরংস), প্রকাশবাদ (ঊীঢ়ৎবংংরড়হরংস), অস্তিত্ববাদ (ঊীরংঃবহঃরধষরংস), ইম্প্রোশনিজম (ওসঢ়ৎবংংরড়হরংস), এবসার্ডবাদ (গড়াবসবহঃ ড়ভ ঃযব অনংঁৎফ), কলা কেবল্যবাদ (অৎঃ ড়ভ অৎঃ ঝধশব) প্রভৃতি| এছাড়াও বাস্ত্মববাদ, বিচ্ছিন্নতা, বীটনিক, ভাবপ্রেক্ষলবাদ, মরমিয়াবাদ-এর অবদানও অনস্বীকার্য|

সাহিত্যকার নতুনরূপে নববিন্যাসে নতুন ভাষাও অলঙ্করণে তাঁর চিন্ত্মার ফসল পাঠকের কাছে তুলে ধরেন| সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা থেকেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিবিধ আন্দোলন| প্রচলিত রীতি ও ছকের বাইরে এসে নতুনভাবে নুতন কথা বলার জন্য একজন প্রকৃত স্রষ্ঠা ব্যাকুল হন,- ব্যাকুলতাই তাঁকে নতুন ভাষা জোগায়| পথ দেখায়- জন্ম নেয় এক রীতি থেকে নতুন রীতির, তখন তাকে বলা হয় সাহিত্যীয় রীতির আন্দোলন|

যেমন ক্ল্যাসিকাল রীতিতে লেখা চলছে, একদল নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করলেন- সেই রীতির নাম হল রোমান্টিক পদ্ধতি| এইভাবে আন্দোলনের জন্ম| আবার রোমান্টিক রীতিতে যখন পাঠক ক্লান্ত্ম, এর রুচিপ্রিয়তা নিয়ে লেখকের মনে সংশয় জাগছে, তখন তিনি নতুন করে হয়তো পথের খোঁজ পেলেন| এভাবে জন্ম নিয়েছে বিবিধ সাহিত্যিক মতবাদ|

সাহিত্যের বিভিন্ন শ্রেণির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গিয়ে যে কথাটি না বললেই নয়, তা হল- সাহিত্যের এই প্রকারভেদ কেবল আঙ্গিক ভেদ বা ভড়ৎস এর পার্থক্য নয়| অনেক সময় তার বিষয়েরও পার্থক্য বোঝায়| যে কোন সাহিত্যেই সবচেয়ে আগে যে সাহিত্য প্রকরণ দেখা দিয়েছে তার নাম কবিতা| বাংলা সাহিত্যও তার ব্যতিক্রম নয়| পদ্যমাধ্যমে লেখা রচনা মাত্রই কবিতা হিসাবে গ্রহণ করলে অবশ্য

Correspondence
Rumpa Bhadra
ফন্টের নাম:- ঝঁঃড়হহুগল
ফন্টের সাইজ:- ১৪
টাইপ করা হয়েছে:- মাইক্রোসফ্ট্ ওয়ার্ড-এ
Email: rumpabhadra80@gmail.com

কবিতা নামক প্রকরণটির ব্যপ্তি এতো বেড়ে যায় যে তার বিভিন্ন উপবিভাগ সম্বন্ধে আলোচনায় শক্ত হয়ে পড়ে| একেবারে প্রাথমিক বিভাগ করার জন্য আমরা তার আকৃতি ও প্রকৃতি উভয়কেই আশ্রয় করে থাকি| কবিতার আকৃতি বা আয়তনগত বিভাগ করতে হলে কবিতাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়|- খন্ড কবিতা ও দীর্ঘকবিতা|

বঙ্কিমচন্দ্র প্রাথমিক বিভাগে সাহিত্যের প্রধানভাগ ছিল দুটি- কবিতা এবং নাটক| সংস্কৃত সাহিত্যে এবং ইউরোপীয় সাহিত্যে নাটক এক সুপ্রাচীন সাহিত্য শ্রেণি| সংস্কৃতে একে বলা হয় দৃশ্যকাব্য এবং পঞ্চমবেদ| প্রাচীনকালেই ভরত মুনি এর লক্ষণ নির্ণয় করে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন| বাংলা সাহিত্য প্রকরণের রীতি অনুসারে অনেকগুলি বিভাগ মেনে নেওয়া হয়েছে| স্থূলভাবে বলতে গেলে, পাঁচটি প্রধান দিক থেকে নাটকের শ্রেণিবিভাগ করা সম্ভব| যথা আকৃতি, রসগত, প্রকারণগত, আন্দোলন মুখ্য, বিষয় ভিত্তিক ইত্যাদি|

এছাড়া প্রতিটি নাটকের বিভাগের আবার বেশ কয়েকটি উপবিভাগ আছে| যেমন- পূর্ণাঙ্গ, একাঙ্গ, কমেডি, ট্র্যাজেডি, ইত্যাদি ছাড়াও বিবিধ প্রকারের নাটকের পরিচয় আমরা পাই|

উপন্যাস সাহিত্য সংসারের আধুনিক প্রকরণ| মানুষ সম্পর্কে মানুষের উৎসাহ, শ্রদ্ধা এবং আমাদের যথার্থ বাস্ত্মবতার বোধ না জাগা পর্যন্ত্ম উপন্যাসের আবির্ভাব সম্ভব ছিল না| বাংলা সাহিত্যে ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে উপন্যাসের উদ্ভব ঘটে এবং উপন্যাসের সার্থক পথিকৃত হিসাবে এখনও পর্যন্ত্ম বঙ্কিমচন্দ্রই স্বীকৃতি লাভ করে থাকেন|

সাধারণভাবে বলা যায় যে, উপন্যাসের বিষয়গত বিভাগ গড়ে উঠেছে তার অবলম্বিত বিষয়ের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে| আসলে উপন্যাসের ক্ষেত্রে বিষয় এবং তার উপস্থাপন রীতি এত ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত যে একটিকে অপরটির নিরপেক্ষ বলা সম্ভব নয়| সাহিত্য সংসারে ছোটগল্প নবাগত| ছোটগল্পকে বলা হয় 'ঊনবিংশ শতকের বিস্ময়|' কনিষ্ঠতম হলেও সবচেয়ে প্রাণবান| জীবনীশক্তিতে ভরপুর এই সাহিত্য প্রকরণ বৈচিত্রে ও ঐশ্বর্যে পাঠকের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে বলা যায়| ছোটগল্প সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন 'ছোট গল্প' এই নামের মধ্যেই লুকিয়ে আছে এর রীতি প্রকরণ কেমন হবে| একে আগে ছোট হতে হবে তারপর গল্প| যদিও এভাবে ছোটগল্পের বিচার হয় না| কারণ রবীন্দ্রনাথের নষ্ঠনীড়-দীর্ঘবয়স হলেও তা ছোটগল্পের স্বীকৃতি পেয়েছে| অন্যদিকে বনফুলের লেখা অতিক্ষুদ্র আয়তনের রচনারীতি পদ্ধতিও ছোটগল্পের মর্যাদালাভ করেছে|

'ছোটগল্প' এই বিষয় নিয়ে ইংরাজী সাহিত্যে বিস্ত্মর আলোচনা হয়েছে| বাংলা সাহিত্য ও পিছিয়ে নেয়| নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সাহিত্য ছোটগল্প'-এ বিষয়ে বিশেষভাবে উলে-খযোগ্য| ছোটগল্পের উদ্দেশ্যের একমুখীনতা বা ঝরহমষবহবংং ড়ভ ঢ়ঁৎঢ়ড়ংব কে প্রায় সব সমালোচকই স্বীকার করে নিয়েছেন| একমুখীনতার উপর ভিত্তি করে ছোটগল্পকে প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে| ঘটনামুখ্য (ঝঃড়ৎু ড়ভ ওহপরফবহঃ) চরিত্রমুখ্য (ঝঃড়ৎু ড়ভ পযধৎধপঃবৎ) এবং প্রতীতিমুখ্য ছোটগল্প (ঝঃড়ৎু ড়ভ ওসঢ়ৎবংংরড়হ)| তবে প্রতীতিমুখ্য বা ওসঢ়ৎবংংরড়হ ই ছোটগল্পের মূল কথা| ছোটগল্প পাঠের পর পাঠক মনে যে প্রতীতি বা ওসঢ়ৎবংংরড়হ জন্মায় সেখানেই নিহিত আছে ছোটগল্পের শিল্প সার্থকতা|

উনিশ শতকে ছোটগল্পের কেন জন্ম হল-এ প্রশ্নের উত্তর এত সহজ নয়| তবে একটা জিনিস সুস্প ষ্ট যে, আধুনিক ছোটগল্প হল যুগযন্ত্রনার ফসল| তাছাড়া যে কোনো যুগসন্ধির প্রতিক্রিয়া দুভাবে ঘটে| ব্যক্তিমূলক ও সমাজমূলক| উনিশ শতকের জ্ঞুদ্ধ জিজ্ঞাসামূলকতার ধর্মটিকে বহুমুখী আঙ্গিক এবং বিষয়বস্তুর ভিতর দিয়ে ত্রিবিধপদ্ধতিতে বুঝিয়ে দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন ছোট গল্পকার| ছোটগল্পের প্রকৃতি সম্পর্কে মন্ত্মব্য- ওওহ ঃযব যিড়ষব পড়সঢ়ড়ংরঃরড়হ ঃযবৎব ংযড়ঁষফ নব হড় ড়িৎফ ৎিরঃঃবহ ড়ভ যিরপয ঃযব ঃবহফবহপু, ফরৎবপঃ ড়ৎ রহফরৎবপঃ, রং হড়ঃ ঃড় ঃযব ড়হব ঢ়ৎব-বংঃধনষরংযবফ ফবংরমহ...... রং লঁংঃ ধং বীপবঢ়ঃরড়হধনষব যবৎব ধং রহ ঃযব ঢ়ড়বস; নঁঃ হফঁবষবহম ঃযব রংংুবঃ ঃড় নব ধাড়রফবফ্

এযব ঢ়যরষড়ংড়ঢ়যু ড়ভ ঃযব ংযড়ৎঃ ঃড়ৎু গ্রন্থে গধঃযবঁং ছোটগল্প সম্পর্কে এই অভিমত দেন-

এযব ংযড়ৎঃ ঃড়ৎু নু রঃং বভভবপঃ, ধ পবৎঃধরহ ঁহরঃু ড়ভ রসঢ়ৎবংংরড়হ যিরপয ংবঃ রঃ ধঢ়ধৎঃ ভৎড়স ড়ঃযবৎ শরহফং পযধৎধপঃবৎ, ংরহমষব বাবহঃ, ধ ংরহমষব বসড়ঃরড়হ ড়ৎ ঃযব ংবৎরবং ড়ভ বসড়ঃরড়হং পধষষবফ ভড়ৎঃয নু ধ ংরহমষব ংরঃঁধঃরড়হ্

ম্যাথুজ ছোটগল্পের যে প্রতীতির কথা বলেছেন সেই বিষয়ের ওপর অত্যন্ত্ম জোর দিয়েছেন ঋবধহ ঙ ঋধড়ষধরহ. তাঁর মতে-

ভঞওযব ঝযড়ৎঃ ঝঃড়ৎু রং ধহ বসড়ঃরড়হধষ ঢ়বৎংড়হধষ বীঢ়ড়ংরঃরড়হ. ডযধঃ ড়হব ৎবধৎপযবং ভড়ৎ ধহফ যিধঃ ড়হব বহলড়ুং রহ ধ ংঃড়ৎু রং ধ ংঢ়বপরধষ ফরংঃরষষধঃরড়হ, ধ ঁহরয়ঁব ৎবহংরনরষরঃু যিরপয যধং ৎবপড়মহরংবফ ধহফ ৎবষবপঃবফ ধঃ ড়হপব ধ ংঁনলবপঃ ঃযধঃ ধনড়াব ধষষ ড়ঃযবৎ ংঁনলবপঃ, রং ড়ভ াধষঁব ঃড় ঃযব ৎিরঃবৎং ঃবসঢ়বৎধসবহঃ ধহফ ঃড় যরং ধষড়হব- যরং পড়ঁহঃবৎঢ়ধৎঃ যরং ঢ়বৎভবপঃ ড়ঢ়ঢ়ড়ৎঃঁহরঃু ঃড় ঢ়ৎড়লবপঃ যরসংবষভ.চ

ছোটগল্প কি বা ছোটগল্প বলতে আমরা কি বুঝি এ সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন| রবীন্দ্রনাথ 'সোনারতরী' কাব্যগ্রন্থের বর্ষাযাপন কবিতায় সেই অংশটুকু ছোটগল্পের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রনিধান যোগ্য|

"ছোট প্রাণ, ছোট ব্যাথা
ছোট ছোট দুঃখ কথা

নিতান্তই সহজ সরল
সহস্র বিস্মৃতিরাশি
প্রত্যহ মেতেছে ভাসি
তারি দু-
চারটি অশ্রুজল|
নাহি বর্ণনার ছটা
ঘটনার ঘনঘটা
নাহি
তত্ত্ব, নাহি উপদেশ
অন্তরে অতৃপ্তি রবে
সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ
হয়ে হইল না শেষ|"

ছোটগল্পকার নারায়ন গঙ্গপাধ্যায় ছোটগল্পের সংজ্ঞায় বলেছেন-

ছোটগল্প লেখকের মানস প্রতীতি-জাত একটি সংহত গদ্যকাহিনী -যার অন্যতম বক্তব্য কোন ঘটনা, চরিত্র, পরিবেশ, অবলম্বন করে ঐক্য সংকটের মধ্যদিয়ে সমগ্রতা লাভ করে|

চলমান জীবনের অখন্ডতাকে রূপ দেওয়ার সুযোগ ছোটগল্পের নেই; সেই জীবনের একটি অংশকে চকিত আলোর দীপ্তিতে ছোটগল্প আলোকিত করে তোলে| আর তাতেই ধরা পড়ে গোটা জীবনচিত্র| ছোটগল্পের সূচনা ঘটে জীবনের মাঝখান থেকে; সূচনা থেকে নয়| আসলে ছোটগল্পের সূচনা হবে এমন- সেখানে কোনো ভূমিকা নেই; নেই আড়ম্বর| আছে শুধু সংযম| সংযমই ছোটগল্পের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য উপন্যাসের মতো মন্থরগতিতে কাহিনীর ভিতরে প্রবেশ ঘটে না ছোটগল্পের| এখানে একেবারে সোজাসুজি গল্প গিয়ে ঢুকে পড়ে| গল্প লেখকের সম্পর্কে এডগার অ্যালান পো-র অভিমত হল- 'ওভ যরং াবৎু রহরঃরধষ ংবহঃবহপব ঃবহফ হড়ঃ ঃড় ঃযব ড়ঁঃনৎরহম ড়ভ ঃযরং বভভবপঃ, ঃযবহ ঃযব যধং ভঁরষবফ রহ যরং ভরৎংঃ ঃবঢ়্থ ছোটগল্পকারকে গল্প সম্বন্ধে একটি আভাস দেওয়া এবং প্রথম থেকেই একেবারে গল্পের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া- স্বল্প উপকরণে বিরাট প্রতিক্রিয়া তৈরি করার দিকে রচনাকারকে লক্ষ্য রাখতে হয়|

ছোটগল্পের বিভিন্ন লক্ষণের মধ্যে একটি অন্যতম হল- একমুখীনতা| একটি এবং একমাত্র একটি উদ্দেশ্য নিয়েই ছোটগল্প রচিত হবে| জীবন অনেক বড়ো ব্যাপ্তিময়| সেই ব্যক্ত জীবন-ভূমির কোনো একটি বিশেষ অধ্যায়কে আলোকিত করার দায় নেয় ছোটগল্পকার| বাকি সব অন্ধকার থাক না, কিন্তু ওই স্বল্পস্থানের তীব্র উদ্ভাস সমস্ত মানুষটাকে স্পষ্ট করে তোলে|

এই একমুখীনতাই হল ছোটগল্পের সাফল্যের মূলমন্ত্র| আবেগের বশবর্তী হয়ে অথবা জনপ্রিয়তার প্রলোভনে এই একমুখীনতা থেকে চ্যুত হলেই ব্রতচ্যুত হবে ছোটগল্প| মানুষ সারাজীবন বাঁচে না, বাঁচে শুধুমাত্র কয়েকটি অবিস্মরণীয় স্মৃতির মুহুর্ত নিয়ে| আসলে ছোটগল্প লিখতে গিয়ে রচনাকার কখনই উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্মৃত হবেন না|

ছোটগল্প মূলত অনুভুতিমূলক| কবি কবিতায় তাঁর যে ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতির কথা ব্যক্ত করেন, ছোটগল্পের ক্ষেত্রে লেখক শুধু তারই সম্প্রসারণ ঘটান মাত্র| এ প্রসঙ্গে হীরেণ চট্টোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যে প্রকরণ গ্রন্থে বলেছেন- 'একটি মানুষ আসলে প্রতিদিনের ব্যবহারে হাজারটা মানুষ হয়ে যায়, নিজের মধ্যে সে অজস্র সত্তাকে সঙ্গে নিয়ে চলে, বিশেষ মুহুর্তে ও বিশেষ পরিস্থিতিতে সেটা বোঝা যায়| কখনো নিজেকে সেই ভাবে জানা বা চেনা ব্যক্তির মধ্যে অচেনা সত্তার আবিস্কার লেখক করতে পারেন তাঁর ছোটগল্পে|'

ছোটগল্পের বিষয় কি হতে পারে এ বিষয়ে বলা যায় সব বিষয় নিয়েই ছোটগল্প রচিত হতে পারে| যে কোনো বিষয়কে অবলম্বন করে লেখক তাঁর অনুভূতি মানসিকতা দ্বারা তিনি প্রকাশ করেন গল্পের মধ্যে| এ প্রসঙ্গে মতপার্থক্য আছে| যেমন- একদল মনে করেন, যে কোনো বিষয় অর্থাৎ বিষয়ভিত্তিক

স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন| অপরদলের অভিমত যে কোনো বিষয়কে ঘিরে ছোটগল্প লেখা হতে পারে ঠিকই তবে, তাতে মুর্হূতের আন্দোলিত মানসিকতা, বিষন্নতা, ভালোবাসা পাওয়া না পাওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলোও যেন মূল্য পায়| অর্থাৎ ছোটগল্পে যেমন গল্পের মূল্য থাকবে তেমনি থাকবে গল্পকারের অনুভূতি এবং বিশেষ প্রতীতির মূল্যও| ছোটগল্পের শেষ হয়ে গেলেও কোথায় যেন পাঠক মনে থেকে যায় এক অতৃপ্তির আভাস| আসলে ছোটগল্পের ধরনটাই তো এইরকম| চকিত আলোর দ্যুতিতে জীবনের খন্ডচিত্রকে আলোকিত করেই আবার হারিয়ে যাওয়া| পূর্ণতার আভাস তো দিতে পারে উপন্যাস| যেমন রবীন্দ্রনাথের লেখা ‘চোখের বালি’ উপন্যাসে লেখক পূর্ণতার আভাস দিতে চেষ্টা করেছেন| সেক্ষেত্রে কালগত চিন্তাভাবনার ধারা লেখক প্রভাবিত হয়েছেন ঠিকই; কারণ বাস্তবকে অস্বীকার করে উপন্যাস হতে পারে না|

তবে ছোটগল্পের মধুর অতৃপ্তির বিপক্ষে একদল সমালোচকের অভিমত হল- পাঠকের প্রতি এতে অবিচার করেন রচনাকার| যারা এই মধুর অতৃপ্তিকে অপছন্দ করেছেন, তাদের দুটো দল আছে| একদল শান্ত স্বচ্ছন্দ উপসংহার পছন্দ করেন যেমন রবীন্দ্রনাথের দেনাপাওনা| আর এদেরই আর একটি দলের অভিমত হল ছোটগল্প পরিসমাপ্তি হবে ঠিক এইরূপ- এক বিরাট ব্যাপ্তি দান করে একটি বিশেষ সত্য শাশ্বত সত্যেপরিণত হয়- এইরকম হবে ছোটগল্পের পরিসমাপ্তি| যেমন ‘মহাশ্বেতা দেবীর’ ‘হারুন সালেমের মাসি’ গল্পে হারা ও গৌরবি সংকীর্ণ গ্রাম্যজীবনকে পরিত্যাগ বৃহত শহরে জীবনের ভিড়ে মিশিয়ে দিতে প্রয়াসী হয়েছেন লেখক| সংকীর্ণ জাত-পাতের ভেদাভেদ ঊর্দ্ধে উঠে লেখক মহাশ্বেতাদেবী জীবনের একটি শাশ্বতসত্য ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন|

অপরদিকে ছোটগল্পের অন্তিম পরিণতিতে যারা নাটকীয় চমক পছন্দ করেন, তাদের একদলের মতে
ছোটগল্পের পরিণতি হবে চমকজাগানো উপসংহার| অর্থাৎ যিরঢ়-পৎধপশ বহফরহম. এই চাবুক হাঁকড়ানো পরিসমাপ্তি যারা পছন্দ করেন তাদের কে বলা যেতে চরমপন্থী দল| এই জাতীয় গল্পকার হলেন এনগার অ্যালান পো, চমাপাঁসা প্রমুখ| বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দেনাপাওনা গল্পের অন্তিম পরিণতি এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য|

ছোটগল্পের শ্রেণিবিভাগের বিভিন্ন জন ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন| বিষয় অনুযায়ী ১) ব্যক্তির নিজস্ব সমস্যা এবং ২) ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পারিক সমস্যা বিশে-ষণ| এই দুই বিভাগের মধ্যবর্তী হয়ে বহু ছোটগল্প রচিত হয়েছে| নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায় মোট ১২টি উপবিভাগ করেছেন| যথা দার্শনিক, সমাজ-সমস্যা মূলক, নারী পুরুষের মধ্যগত সম্পর্ক ও প্রশ্নাত্মক মনস্তাত্ত্বিক, রোমান্টিক, চরিত্রাত্মক, রূপক, ব্যাঙ্গমূলক, কাব্যধর্মী, আদর্শাত্মক ও রাজনৈতিক এবং বিচিত্র| ‘সাহিত্য সন্দর্শন’ গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীশচন্দ্র দাস ১৫টি ভাগের কথা বলেছেন ছোটগল্পের বিভাগ সম্পর্কে| যথাঃ

১) প্রেমবিষয়ক- প্রেমই এখানে প্রধান ভূমিকা নিয়ে থাকে উদাহরণ ঃ রবীন্দ্রনাথের ‘শেষরাত্রি’,

২) সামাজিক-সমাজ সমস্যামূলক কোনো গল্প যেমন- রবীন্দ্রনাথের দেনাপাওনা, শরৎচন্দ্রের ‘মহেশ’,

৩) প্রকৃতি ও মানুষ-এই শেণির গল্পে প্রকৃতির পটভূমিকায় চরিত্র আঁকা হয়ে থাকে এবং মানুষের সুখ-দুঃখের পশ্চাদপদ রচিত হয়| বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের কিছু লেখা এই জাতীয় বিভাগের মধ্যে পড়ে|

৪) অতিপ্রাকৃতি- ভৌতিক বা অলৌকিক জগতের অবতারণা না করে কেবলমাত্র অতিপ্রাকৃতের রহস্য পাঠককে অভিভূত করে রাখাই এই জাতীয় রচনার বৈশিষ্ট্য| যেমন-এডগার অ্যালান পো-র ‘ব-্যাক ক্যাট’, সত্যজিত রায়ের ‘নীল আতঙ্ক’|

৫| হাস্যরসাত্মক ঃ সামাজিক অসঙ্গতি, চরিত্রগত অতিরঞ্জন বা ঘটনাগত কোনো অসঙ্গতি এই জাতীয় রচনায় হাসির উদ্রেগ ঘটায়| সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের- ‘সোভা-কাম বেড’ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ|

৬| উদ্ভট ঃ ইংরেজিতে ঋধহঃধ্‌ং বলা হয়, তাকেই উদ্ভট জাতীয় গল্প বলা হয়| অসম্ভব কল্পনার মধ্যে কৌতুকই সাধারণত প্রধান হয়ে উঠে| পরশুরামের ‘গগনচটি’, কেদারনাথ বন্দোপাধ্যায়ের ‘ভগবতীর পলায়ন’- এই জাতীয় ছোটগল্পের উদাহরণ|

৭| সাঙ্কেতিক গল্প ঃ আপাতবর্ণিত বিষয় বা ঘটনা যেখানে একটি রহস্যময় সঙ্কেতকে আশ্রয় করে থাকে, সেখানে এই শ্রেণির গল্পের উদ্ভব ঘটে| রূপকধর্মী বা অষষবমড়ৎরপধষ গল্প এই শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত নয়, ঝুসনড়ষরপ বা সাঙ্কেতিক ব্যঞ্জনাই এসব গল্পের প্রাণ| রবীন্দ্রনাথের একটি অসম্ভব গল্প, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘রাতের গাড়ি’ প্রভৃতি এই জাতীয় গল্পের উদাহরণ|

৮| ঐতিহাসিক ঃ ইতিহাসের পটভূমিকায় কথাসাহিত্যকগন উপন্যাস লেখার ব্যাপারেই বেশী আগ্রহী হন, তবে ছোটগল্পেও ঐতিহাসিক আখ্যানকে অবলম্বন করা হতে পারে| এই জাতীয়

গল্পের উদাহরণ হল- রবীন্দ্রনাথের ‘দলিয়া’, বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের ‘প্রত্নতত্ব’ ইত্যাদি৷

৯৷ বিজ্ঞান নির্ভর ঃ এই জাতীয় গল্পকে ইংরেজিতে বলে সায়েন্স ফিকশন৷ বিজ্ঞানের কোন প্রতিষ্ঠিত সত্যকে অবলম্বন করে সুস্থ কল্পনার দ্বারা এরকম গল্প লেখা হয়৷ উদ্ভট গল্পেও মাঝে মাঝে বিজ্ঞান থাকে বটে, কিন্তু বিজ্ঞানের প্রতি কোনরকম আনুগত্য সেসব গল্পে থাকে না৷ প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘ঘনাদার’ গল্পের উদাহরন৷

১০৷ গার্হস্থ্য ঃ পারিবারিক বা গার্হস্থ্য জীবন অবলম্বন করে লেখা গল্পকেও একটি স্বতন্ত্র শ্রেণিতে ফেলা যেতে পারে৷ চেকভ ও রবীন্দ্রনাথের গল্পে এর অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে৷

১১৷ মনস্ত্মাত্ত্বিক ঃ পৃথক শ্রেনিতে মনস্ত্মাস্ত্বিক গল্পকে বিন্যস্ত্ম করা শক্ত, কারণ মনস্ত্মত্ত্ব নির্ভর না হলে ছোটগল্পের আকর্ষনই অনেক কমে যায়৷ তবু মনস্ত্মত্ত্বিক জটিলতা অত্যধিক প্রাধাণ্য পেলে তাকে আমরা এই শ্রেণিতে ফেলতে পারি, যেমন রবীন্দ্রনাথের একরাত্রি, বিমল মিত্রের- ‘লজ্জাহর’ ইত্যাদি৷

১২৷ মনুষ্যেতর ঃ মানুষ ছাড়া অন্যান্য জীবজন্তু নিয়েও অনেক গল্পলেখা হয়েছে৷ এমনকি একটি গাড়ি নিয়ে লেখা ‘সুবোধ ঘোষের ‘অযান্ত্রিক’ গল্পটি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প হিসাবে স্বীকৃত৷ এই জাতীয় গল্পের মধ্যে উলে-খযোগ্য বালজাকের ওচধংংরড়হ রহ ঃযব ফবংবৎঃ তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের ‘কালাপাহাড়’ ইত্যাদি৷

১৩৷ বাস্ত্মবনিষ্ঠ গল্প ঃ ছোটগল্পমাত্রই বাস্ত্মবনিষ্ঠ হয়ে থাকে, অন্ত্মত তাই হওয়াই উচিত৷ তবু সাধারণভাবে ন্যাচারালিস্ট আন্দোলনে উদ্ভুত গল্পগুলিকে এই শ্রেণিতে ফেলা হয়৷ বাংলা ছোটগল্পের মধ্যে শৈলজানন্দের ‘কয়লা কুঠির গল্প’, ‘সমরেশ বসু’র ‘পাড়ি’ প্রভৃতি এই শ্রেণির অন্র্ত্মভুক্ত হতে পারে৷

১৪৷ গোয়েন্দাগল্প ঃ অপরাধ জগৎ ও অপরাধীকে ধরার ব্যাপারে পুলিশ গোয়েন্দার তৎপরতা যে সব ছোটগল্পে দেখা যায় তারা এই শ্রেণির মধ্যে পড়ে৷ সত্যজিত রায়, নীহারঞ্জন গুপ্ত এই জাতীয় ছোটগল্পের প্রণেতা৷

১৫৷ বিদেশী পটভূমিকায় গল্প ঃ এই শ্রেনিতে পড়ে রাখাল সেনের ‘সহযাত্রী’, মণীন্দ্রলাল বসু’র ‘হোটেলওয়ালা’ ইত্যাদি ছোটগল্প৷

ছোটগল্পের প্রকৃতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন পাশ্চাত্য সমালোচকগণ৷ তারা ছোটগল্পের তিনধরণের শ্রেণিকরণ করেছেন৷

ক) ঝঃড়ৎু ড়ভ ওহপরফবহঃ বা ঘটনামুখ্য গল্প৷

খ) ঝঃড়ৎু ড়ভ ঈযধৎধপঃবৎ বা চরিত্রমুখ্য গল্প৷

গ) ঝঃড়ৎু ড়ভ ওসঢ়ৎবংংরড়হ বা প্রতীতিমুখ্য গল্প

ক) ঝঃড়ৎু ড়ভ ওহপরফবহঃ বা ঘটনামুখ্য গল্প:- কোনো গল্পকে ঘটনামুখ্য আমরা তখনই বলতে পারি, যখন ঘটনাই গল্পকে নিয়ন্ত্রণ করে৷ এবং ঘটনার অপ্রত্যাশিত মোচড় থেকেই পাঠকের মনে প্রতীতির সৃষ্টি হয়৷ গোয়েন্দা গল্প বা ভৌতিকগল্প ঘটনা প্রাধান্যপেয়ে থাকে৷ তবে নিয়মের ব্যতিক্রম হিসাবে রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত পাষাণ৷

খ) ঝঃড়ৎু ড়ভ ঈযধৎধপঃবৎ বা চরিত্রমূখ্য গল্প:- চরিত্রমুখ্য গল্প বিদেশি সাহিত্যে এবং বাংলাসাহিত্যে আমরা দেখতে পাই৷ একটি বিশেষ চরিত্রকে অবলম্বন করেই এজাতীয় গল্প লেখা হয়ে থাকে৷ চরিত্রের একটি দিককে তুলে ধরেন রচনাকার৷ আবার চরিত্রের একটি বিশেষ প্রবণতার কথাও বার বার বলতে চেষ্টা করেন এই জাতীয় ছোটগল্পে৷ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতীতমুখ্য গল্পে শেষ পর্যন্ত্ম একটি প্রতীতি বা ওসঢ়ৎবংংরড়হ বড় হয়ে ওঠে৷ গল্পে চরিত্র ও ঘটনাকে অতিক্রম করে যদি এই ধারণাটিই মনে গেঁথে যায়৷ বলা যাবে গল্পটি প্রতীতিমুখ্য ছোটগল্পের অন্ত্মর্গত৷

এই জাতীয় বিচার অর্থাৎ প্রতীতিমুখ্য গল্পের বুনট বা ধারণা অনেক সময় পাঠককে জটিল বিভ্রান্ত্মির মধ্যে ফেলে দেয়৷ যেমন-রবীন্দ্রনাথের ‘ছুটি’ গল্পে এমন মনে হওয়া সম্ভব যে ফটিকই সেখানে মুখ্য অবলম্বন৷ তবে গল্পের অন্ত্মিম একটি প্রতীতিই বড়ো হয়ে ওঠে যে নিজের পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করলে মানুষের অবস্থা ভয়াবহ হয়ে ওঠে৷ সে মানসিক শান্ত্মি পায় না এবং পরিণতিতে চূড়ান্ত্ম কিছুবিপর্যয় অপেক্ষা করে৷ যেমন- নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়ের রেকর্ড, বিমল করের ‘নিষাদ’ ইত্যাদি এই জাতীয় রচনার মধ্যে পড়ে৷

উপন্যাস রচনায় চষড়ঃ ঈড়হংঃৎঁপঃরড়হ বা বৃত্তগঠনের যেমন ভূমিকা আছে, ছোট গল্পেরও সুনিশ্চিত বৃত্তগঠন অপরিহার্য-এর গুরুত্বও উপন্যাসের বৃত্তগঠনের তুলনায় কোনো অংশে কম নয়৷ প্রতীতি অনুযায়ী ছোটগল্পের বৃত্ত গঠিত হয়৷ ছোটগল্পের বৃত্তগঠনে তিনটি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়ে থাকে৷ যথাঃ-

ক) ঝঃধরৎ ঝঃবঢ়- ঈড়হংঃৎঁপঃরড়হ বা সোপানরোহ গঠন৷

খ) জড়পশবঃ ঈড়হংঃৎঁপঃরড়হ বা চকিতোন্নত গঠন৷

গ) ঈরৎপঁষধৎ ঈড়হংঃৎঁপঃরড়হ বা ঘূর্ণরেখ গঠন৷

সোপানরোহ গঠন বলতে বোঝায় ঘটনাক্রমের উন্নতি, চূড়ান্ত্ম পর্যায়ে তার আরোহণ এবং দ্রুত অবনমন৷ নাটকের

প্রথাগত পিরামিড আকৃতির পঞ্চাঙ্ক গঠনের সঙ্গে এর পার্থক্য, ঘটনাগুলি ক্রমশ একটি অঙ্গ বা ঈৎরংরং এ পৌঁছায়| কিন্তু তার পরই দ্রুত সমাপ্তি ঘনিয়ে আসে| এর সঙ্গে চকিতোন্নত গঠনের পার্থক্য এই যে, এই ধরণের বৃত্তে প্রায় প্রথমেই ঈৎরংরং দেখতে পাওয়া যায় অর্থাৎ ঘটনা তুঙ্গে পৌঁছায় প্রথমেই, এরপর লেখক সুকৌশলে ধীরে ধীরে কাহিনীকে রসসিদ্ধ পরিণতি দেবার চেষ্টা করেন| তৃতীয় যে বৃত্তগঠনকে বলা হয়েছে ঘূর্ণরেখ সেখানে বর্তমান কাহিনীকে উপলব্ধ করে একটি ঘূর্ণয়মান অতীত কাহিনি থাকে | দুটি কাহিনিই বৃত্তাকারে বেষ্টন করে থাকে একে অপরকে অথচ তারা প্রত্যেকেই থাকে গতিশীল|

ছোটগল্পের প্রধান গুণ সংযম| একথাও অনস্বীকার্য যে, গল্পের প্রয়োজন অনুযায়ী ভাষারীতির পরিবর্তন ঘটবে| ভাষারীতি কখনও হবে খুৎরপধষ বা কাব্যিক রীতি| ছোটগল্পের বিষয় এবং প্রতীতি অনুযায়ী তার রীতির পরিবর্তন ঘটে| অনেক সময় একই লেখক গল্পের মেজাজ অনুযায়ী তার ভাষারীতি পালটে ফেলেন| কোন কোন ছোটগল্পকার তাঁদের বিশেষ মানসিক গঠনের জন্য একটি বিশেষ রীতি বেছে নিয়ে থাকেন| জগদীশ গুপ্ত বিশ্বাস মনে করেন যে, জীবনের নাটক খুব অল্প| রচনাকার তাই চমকিত ঘটনা ঘটলেও তার তিনি বিবরণ দেন একবারেই অনুত্তেজক ভাষায়| তাই তাঁর বেশির ভাগ গল্পেই ভাষারীতি বর্ণনাত্মক| কাব্যিক- রীতি অবশ্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় গল্পেরই স্বার্থে, যদিও এক একটি পর্বে এক একটি ভাষারীতি প্রধানভাবে আশ্রয় করেছেন এমন লেখকও আছেন| নাটকীয় রীতির উদাহরণও রবীন্দ্রনাথের একটি গল্পে দেখা যায়- ‘বদনাম’| ‘ইন্সপেক্টর ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই ঝংকার দিয়ে উঠলেন-এমন করে তো আর পারি নে, রাত্তিরের পর রাত্তির খাবার আগলে রাখি’- নাটকীয় রীতিতে বর্ণিত ছোটগল্পের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত|

ছোটগল্প নিয়ে বর্তমানে ইংরাজীও বাংলা সাহিত্যে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে| এর মধ্যে আঙ্গিক পরীক্ষা ও যেমন আছে, তেমনি আছে বিষয় ভিত্তিক পরীক্ষা| গল্পের বিষয়হীনতা বা না-গল্প নিয়ে বর্তমানে কেউ কেউ খুব চিন্তিত| এটাকে চিন্তার বিষয় বলে অনেকে তবে মনে করেন না| কারণ গল্পের আকর্ষণই চিরকাল বজায় থাকবে| তাই না- গল্পের সময়েও গল্প বলা ছোটগল্পের সৃষ্টি ব্যহত হবে না| কিন্তু পাঠক হিসাবে যতই পরিণতি আসবে আমাদের, ততই আমরা ছোটগল্পের মধ্যে খুঁজবো স্রষ্টাকে| তাঁকে সঠিকভাবে অনুভব করার আনন্দ কিন্তু গল্পপাঠের আনন্দের চেয়ে কম নয়| কাজেই এমন হতে পারে, ছোটগল্প এতে কবিতার কাছাকাছি বসে দাঁড়াবে, ছোটগল্পের আর একটি পরীক্ষা, অথবা সঠিকভাবে বলতে গেলে আর একটি শ্রেণির কথা বলতে হয়| ছোটগল্পের অতিসংহত একরূপ আছে যাকে দেখে মনে হতে পারে ছোটগল্প| এই পরীক্ষামূলক ধারাটির সচেতন প্রয়োগ লক্ষনীয় ভাবে করেছেন বনফুল| এই জাতীয় অতি হ্রস্বগল্পের নামকরণ করে বলা হয়ে থাকে ‘পোষ্টকার্ড স্টোরী’ তাঁর (বনফুলের) এই রকম একটি গল্পের নামকরণ করেছিলেন ‘পোষ্টকার্ডের গল্প’| পাশ্চাত্য সাহিত্যে এই রীতিতে গল্প অনেক আগে থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল| ইংরাজী সাহিত্যে এই জাতীয় গল্পকে বলা হয় ঋরাব সরহঁঃব ংযড়ৎঃ ংঃড়ৎু. অনুগল্প নামটি কিছুটা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা শুরু হয়েছে| গল্পানুও বলেছেন কেউ কেউ| আবার কেউ একে ছোট্টগল্পও বলে থাকেন| এর প্রকৃতি বিচার করে অন্য কোন যুক্তিগ্রাহ্য নাম আমরা প্রস্তাব করতে পারি কি না তা বিচার করে বলা যেতে পারে|

এই জাতীয় লেখাকে আমরা ছোটগল্প বলব| কারণ ছোটগল্পের প্রধান ও সর্বজনস্বীকৃত বৈশিষ্ট্য হল একমুখীনতা বা ঋরহমষবহবংং ড়ভ ঢ়ঁৎঢ়ড়ংব যেটা এ জাতীয় গল্পের সবচেয়ে প্রকট লক্ষণ| ছোটগল্পকে আমরা কথাসাহিত্যের সবচেয়ে সংহত শিল্পরূপ বলে জানি- তাহলে আরও বেশি সংহত বা সংক্ষিপ্ত করার সার্থকতা কোথায় এবং পাওয়া সম্ভব| এখানেই ছোটগল্পের এই ধারণাটি স্বীকার করে নেওয়ার সঠিক উত্তর লুকিয়ে আছে বলে মনে হয়| একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, ছোটগল্পের ও একটি আলাদা উপভোগ্যতা আছে এবং আস্বাদ আছে| সেই আস্বাদন পেতে পারেন রসগ্রাহী পাঠক| আর এই আলোকিত আবেদন তো ফুটে ওঠে লেখনীর জাদুতে|

বাংলা ছোটগল্পের প্রাণপুরুষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর| তবে বাংলা সাহিত্যের প্রথম ছোটগল্প মধুমতী (১২৮০ বঙ্গাব্দ)- লেখক সম্ভবত বঙ্কিম অনুজ শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়| ১২৯০ বঙ্গাব্দের অর্থাৎ রবীন্দ্রসমসাময়িক বাংলা ছোটগল্পের জন্ম দেন প্রমথনাথ চৌধুরী| ‘ফুলদানী’ ‘বাঘের নখ’-ইত্যাদি তাঁরই লেখা| স্বর্ণকুমারী দেবীর বিদ্রোহ (১২৯৪ বঙ্গাব্দে) ভারতী পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়| দেনাপাওনা, পোষ্টমাস্টার, মধ্যবর্তিনী, নষ্টনীড়, ল্যাবরেটরি, রবিবার এছাড়া বহু বহু ছোটগল্পের জন্ম দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ| প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ছোটগল্পে সিদ্ধহস্ত ছিলেন| তাকে বলা হত বাংলার মোপাশাঁ| বাংলা সাহিত্যের জগতে যিনি মানব হৃদয়ের দুর্বলতাকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন- তিনি হলেন

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়| কাশীনাথ, আলোছায়া, নিস্কৃতি, দর্পচূর্ণ, মন্দির, পরেশ, সতী ইত্যাদি গল্প উপহার দিয়েছেন তিনি| শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পগুলিতে ক্ষুদ্রতার মাঝে অসামান্যতার ছোঁয়াপাই আমরা| পাঠকের মনে চিরস্থায়ী দাগ কেটেছে তাঁর লেখা গল্পগুলি|

বাংলা সাহিত্যে যিনি আপাত অর্থে আষাঢ়ে গল্পের অবতারণা করেছিলেন তিনি ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়| তাঁর লেখা ‘গল্পে গরু গাছে ওঠে’| আর ‘বাঘেরা মানুষের মতো কথা কয়’| তবে কয়েকটি গল্পে তিনি নীতিকথার প্রচারমূলক উদ্দেশ্যকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন| ‘পাপের পরিণাম’, ডমরুধর অন্যতম চরিত্র| ব্যঙ্গ রচনার ক্ষেত্রে তাঁর মতো পারদর্শী হলেন রাজশেখর বসু| উদ্ভট কল্পনার অবতারনা ঘটিয়েছিলেন তাঁর রচনাতে| ‘বিরিঞ্চি বাবা’,
‘কজ্জলী’, ‘হনুমানের স্বপ্ন’, ভূশন্ডীর মাঠে’- ইত্যাদি গল্প শুধু হাতির উপাদানমাত্র নয়, লেখকের বুদ্ধিমত্তারও পরিচায়ক|

পূর্ববর্তী রচনাকারদের কিছুটা পিছনে ফেলে আবির্ভূত হলেন কলে-ালযুগের রচনাকারগন| বাংলা কথাসাহিত্যে অনুপ্রবেশ ঘটল ফ্রয়েডীর মনস্তত্ত্ব|ওঝবী রং সধরহ ংঢ়ৎরহম ড়ভ ড়ঁৎ পড়হংপরড়ঁং ষরভব্ধ -ফ্রয়েডের এই সত্য নরনারীর সম্পর্কের উপর প্রেমের প্রাচীন ইমারতে ফাটল ধরাল| অচিন্ত্যকুমার বলেছেন ‘প্রতিক্রিয়াই কলে-ালের প্রাণধর্ম’| তিনি এও বলেছেন- ‘যেমন শোক হতে শে-াকের জন্ম, তেমনি তারুণ্য থেকেই কলে-ালের আবির্ভাব’| এ যুগের অন্যতম লেখকগন হলেন- বুদ্ধদেব বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল, মনীশ ঘটক, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখ|

কলে-াল এর কালে দু’জন সাহিত্যিক যাদের অবদানে বাংলা সাহিত্য ঋদ্ধ হয়েছে- তারাশঙ্কর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দুই বিপরীত মেরুর লেখক হলেও কারোর অবদান কোনো অংশেই ন্যূন নয়| একদিকে ঐতিহ্য লালিত পুরাতন মূল্যবোধ ও ক্ষয়িষ্ণুপ্রথায় শববাহী যাত্রী তারাশঙ্কর| অন্যদিকে মানিকের আমৃত্যু বিচরণক্ষেত্র ছিল ফ্রয়েড ও মার্কস| তিনি ছিলেন মূলত ফ্রয়েডাশ্রয়ী| তাঁর পূর্বসূরী কেউ নেই| পক্ষান্তরে তিনিই সৃষ্টি করেন উত্তর সূরী|

বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় প্রকৃতির ধবংসাত্মক ও সৃজনাত্মক দুটি দিককেই সমন্বয় সাধন করেছেন তাঁর রচনায়| বিশ্ব যখন নৈরাজ্যস্পন্দিত, জীবন যখন দিশেহারা, লক্ষ্য যখন বেপরোয়া, বিভুতিভূষণের নিসর্গ চেতনাকে তখন এস্কোপিস্টের অনুসরণই বলা যায়| তাঁর লেখা ‘দ্রবময়ী’র কাশীরাম’, ‘ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল’, ‘কিন্নরদল’, ‘মেঘমল-ার’, ‘মৌরী ফুল’ ইত্যাদি বিচিত্র চরিত্রের অবতারণ ঘটিয়েছেন| প্রকাশিত হয়েছেন সাহিত্যিকগুণ| অন্যদিকে তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের বেদেনী, নারীও নাগিনী, ডাইনী, কালাপাহাড়,- বিচিত্র ঘটনা, বিচিত্র চরিত্র সৃষ্টিতে লেখকের মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন|

কলে-ালময় লেখকগণ যখন ফ্রয়েডের অবচেতনাবাদকে নির্দ্ধিধায় গ্রহণ করে এবং ফ্রয়েডের দোহাই দিয়ে যৌন চেতনা সম্পকিত মিথুনাশক্তির লীলা খোলাখুলি আলোচনা করেছেন যা রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করে নিতে পারেন নি, বনফুল ওরফে বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ ও সমস্যা প্রবন্ধে বলেছেন-

“বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে যারা কুরুচির বেসাতি করেন, তারা ভুলে যান যে, তাঁরা বিজ্ঞানী নন বিজ্ঞানের বইও তাঁরা লিখছেন না|”

বনফুলের লেখা ছোটগল্প ঐরাবত-মনস্তত্ত্ব মূলক| ‘তিলোত্তমা’- গল্পটি একটি কালোমেয়ের গল্প| ‘ক্যানভাসার গল্পে প্রত্যক্ষ জীবন অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরেছেন লেখক, ‘তাজমহল’- গল্পে নিষ্ঠুর পৃথিবীতে প্রেম ও প্রেমের মূল্য সম্পর্কে লেখকের গভীর দার্শনিকতার ছাপ আছে|
বাংলা কথাসাহিত্যে বিশেষ করে ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে শ্রীসুবোধ ঘোষ এক অবিস্মরণীয় নাম| প্রশস্ত অভিজ্ঞতা ক্ষেত্র, নিপুন পর্যবেক্ষণ, প্রগতিশীল জীবন বিশে-ষণ রচনার মনোহারিত্ব ও কাহিনি গঠনে নৈপুণ্যতা সুবোধ ঘোষের গল্পকে এক বিশিষ্টতা দান করেছে, ‘অযান্ত্রিক’, ‘ফসিল’, ‘গোত্রান্তর’ প্রভৃতি গল্পে লেখকের রচনার মুন্সিয়ানার পরিচয় মেলে|

ত্রিশের দশকে সুবোধ ঘোষ ছাড়াও অপর একজন বিশিষ্ট ছোটগল্পকার হলেন নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায় তিনি যে সময়ের লেখক সেই সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, যুদ্ধকালীন বিপর্যয়, মুদ্রাস্ফীতি, কালোবাজারের রমরমা, খাদ্য ও নিত্যদ্রব্য সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি, বুভূক্ষু নরনারীর হাহাকার, মুনাফাবাজদের পৈশাচিক উল-াস- এ সবই ছিল যুগবৈশিষ্ট্য| এইসব নিয়েই রচিত হয়েছে লেখকের ছোটগল্প, ‘নক্রচরিত’, ‘দুঃশাসন’, ‘পুষ্করা’, ‘হাড়’ ইত্যাদি গল্পে সেদিনের সেই কালোছায়া দেখতে পাই রচনাতে|

সাহিত্যরচনার ধারা অব্যাহত| চার দশকের গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নব্যেন্দু ঘোষ, সন্তোষকুমার ঘোষ প্রমুখ এবং আরও পরবর্তী লেখক আরও নানান উপাচার নিয়ে হাজির হয়েছেন| বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পকে করেছেন সমৃদ্ধশালী|

কালের নিয়মে ছোটগল্পেরও আকৃতি-প্রকৃতিগত পরিবর্তন এসেছে| একেবারে নির্মেদ ছোটগল্পের জন্ম হয়েছে| ‘অনুগল্প’-নামে ছোটগল্পের এক স্বতন্ত্র শাখাগড়ে উঠেছে| বিস্তৃত জীবনপট সংক্ষেপে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে তাঁরা|

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবন ও মনের বিস্তৃত পরিচয়ের অনেকটাই অপ্রকাশিত| খন্ড খন্ডভাবে লেখক সম্পর্কে যতটুকু জানা যায়, তা হল উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর জেলার বালিয়াডাঙ্গিতে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে (বাংলা ১৩২৫ বঙ্গাব্দের শ্রী পঞ্চমীর পরের দিন) নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন| শৈশবে তাঁর দিদিমা তাকে নারায়ণ বলে ডাকতেন| বন্ধুমহলে নাড়ু নামে পরিচিত ছিলেন| তাঁর পোষাকী নাম ছিল তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়| বাবা প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন পুলিশ দারোগা| দীর্ঘ চেহারার গৌরবর্ণ সুপুরুষ মানুষটি কলেজের ভালো ছাত্র হিসাবে খ্যাতি পান| মাকে ছেলেবেলাতে হারান লেখক| মা’র সম্পর্কে তাঁর অভিমত–

“আমাদের দিনাজপুরের সেই বাড়ি| বাড়ির কথা মনে পড়লেই মা’র কথা মনে পড়ে| মা ছিলেন সংসারে লক্ষীপ্রতিমার মতো| ছায়ার মতো নিঃশব্দ মা’র চলাফেরা| ঘোমটার আড়ালে কখনও কখনও দেখা যেত তাঁর শুচিশুভ্র ললাটে সকালের আকাশের সূর্যের মতো লাল টকটকে সিঁদুরের টিপ.... সারাদিন মা থাকতেন সংসারের কাজে ব্যস্ত| মা যে বাড়িতে আছেন সেটা প্রথম অনুভব করলাম যখন মা হঠাৎ চলে গেলেন চিরকালের মতো|”

পড়াশোনার ক্ষেত্রে বরাবর ভালো ছিলেন নারায়ণ| দিনাজপুর জেলার স্কুল থেকে প্রবেশিকা বা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করেন| লেখকের কথায়-

“ আমরা ছোটবেলায় দিনাজপুরেই থেকেছি পাহাড়পুরে| ওখানকার সরকারী জেলা স্কুলের ছাত্র আমি|” এরপর তিনি আই-এ পড়তে যান ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে ১৯৩৩ সালে| এই সময়ে তাঁর বন্ধু ছিলেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র| বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. ক্লাশে ভর্তি হন| এবং প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন| ১৯৪২ সালে জলপাইগুড়ির নবপ্রতিষ্ঠিত আনন্দচন্দ্র কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন| তারপর চলে আসেন সিটি কলেজে ১৯৪৫ সালে| সিটি কলেজে কিছুদিন অধ্যাপনার পর চলে আসেন ১৯৫৬ তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, ১৯৬০ সালে তার বিখ্যাত ‘সাহিত্যে ছোটগল্প’ লিখে ডি.ফিন উপাধি লাভ করেণ| ১৯৫৬ সাল থেকে আ-মৃত্যু তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন|

খুব কম বয়সে এবং ছাত্রাবস্থাতেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়| কম বয়সেই তাঁর গ্রামের একটি মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়| এটি ছিল প্রেমজ বিবাহ| যদিও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো কট্টর ভারতীয় ব্রহ্মচর্যের আদর্শে বিশ্বাসী মানুষ যে কিভাবে প্রেমজ বিবাহ করেছিলেন তা অনেকের কাছেই বিস্ময় উদ্রেগ করে|

প্রথম স্ত্রী- রেণু গঙ্গোপাধ্যায়, এম. পড়ার সময় (১৯৪০) এই বিয়ে হয়েছিল| পরবর্তী জীবনে এই প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক খুবই খারাপ হতে থাকে| এবং দ্বিতীয় বিবাহ হয় আশাদেবীর সঙ্গে| প্রথমে (১৯৪১ এ) তার একটি কন্যাসন্তান হয়| নাম- বাসবী| পরে দ্বিতীয় বিবাহ সূত্রে একপুত্র অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়|

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনে মৃত্যু ছিল আকস্মিক| শেষের দিকে নানা রকম অসুখে ভুগতেন| ডায়াবেটিসের হাইসুগার এবং ব-াডপ্রেসারে বেশ কিছুদিন ভুগেছেন| ৮ নভেম্বর, ১৯৭০ তাঁর অজস্রগুনমুগ্ধ পাঠক ও ছাত্রকে বেদনাসিক্ত করে মাত্র বাহান্ন বছর বয়সে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন|

সাহিত্যিক হিসাবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কয়েকটি পুরস্কার লাভ করেছিলেন| ক্যালকাটা কেমিক্যালের উদ্যোগে ‘কথাশিল্পী’ গল্প প্রতিযোগিতায় পাঠকদের গণভোটে তাঁর ‘ইতিহাস’ গল্পটি শ্রেষ্ঠগল্প হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল| কথাশিল্পী সংকলনের সম্পাদনা করেছিলেন রাধারাণী দেবী ও নরেন্দ্রদেব| ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ আয়োজিত আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন| কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পেয়েছিলেন ‘সরোজিনী স্বর্ণপদক’ ‘বসুমতী সাহিত্য পত্রিকা’ লাভ করেছিলেন দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক ‘সুনন্দর জার্নাল প্রকাশের জন্য| এছাড়া অপ্রতিদন্দী কিশোর সাহিত্য শ্রষ্ঠা হিসাবে ‘রঞ্জিত স্মৃতি’ পুরস্কার ও পেয়েছেন| তবে তাঁর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার মানুষের অপরিসীম শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা|

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেশ কিছু ছোটগল্প আছে যা বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে| যেমন ‘বীতংস’ গল্পের সুন্দরলাল| নামে সুন্দর হলেও অন্তরের কুশ্রীতাই পূর্ণ এই চরিত্রটিকে নিখুঁত ভাবে এঁকেছেন রচনাকার| সংসারজীবন পরিত্যাগ করে পাহাড়ের কোলে বেড়ে ওঠা সাঁওতাল পরগনায় তার বর্তমান ডেরা| অতি সরল মানুষগুলোকে বোকা বানিয়ে

সুন্দর লাল অর্থ সঞ্চয় করেছে সেইসঙ্গে আসামের চা বাগানে কুলি যোগানোর যোগানদার হিসাবে নিজেকে নিযুক্ত করেছে সে। আদিবাসী মেয়ে বুধনীকে তুলে দেবে চা-বাগানের সাহবের হাতে। বীতংস অর্থাৎ ফাঁদ। ফাঁদই তো। সুন্দরলালের মতো মহাভন্ড সাধুর পাতা ফাঁদে পা দিয়েছেন সরল সাঁওতালরা আর পরিনতিতে তাদের জীবনে নেমে এসেছে কুলিজীবন।

হাড় গল্পে দেখি রায়বাহাদুরের কাছে উমেদারীতে এসেছে তার একদা বন্ধু প্রমথ'র ছেলে। শিক্ষিত বেকার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় এগল্পটিকে একটি ঐতিহাসিক দলিল ও বলা যায়। রায়বাহাদুরের কাছে চাকরির সহায়তা পেতে আসা ছেলেটিকে তার (রায়বাহাদুর) সখের হাড় সংগ্রহের গল্প শোনাতে শুরু করেন। সেসব হাড়ে আছে অসাধ্য সাধন করার ক্ষমতা। গল্পের ফ্ল্যাশব্যাকে বর্ণিত হয়ে চলেছে দুর্ভিক্ষ পীড়িত নিরন্ন বুভূক্ষু মানুষের না খেতে পেয়ে তিলে তিলে অন্তিম পরিণতির করুণ বিবরণ। রায়বাহাদুর ধনতান্ত্রিক বুর্জোয়া মানুষেই প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্র। যারা নিজ স্বার্থ ও আত্মগরিমা ও আত্মম্ভরিতা নিয়েই সমাজে একচক্ষু হরিণের মতন। 'হাড়' গল্পে নির্যাতিত অসহায় দরিদ্র মানুষের জীবন বলিদানের প্রতীকী ব্যঞ্জনা রূপে উঠে এসেছে। তাহিতি দ্বীপের বলিহওয়া কুমারী মেয়ে আর কলকাতার বুকে দুর্ভিক্ষ কবলিত ছোট শিশুর 'হাড়' চোষার মধ্যে রয়েছে বঞ্চনার গভীর, দীর্ঘশ্বাস। 'হাড়' এক অর্থে ধনতান্ত্রিক বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থারই নগ্নতার প্রতীক।

'নক্রচরিত' গল্পটি বাংলা ১৩৫০ এর মন্বন্তরের বিভীষিকা চিত্রায়িত হলেও এ গল্পে কালোবাজারী মহাজনের ভয়ঙ্কর চিত্রটি মুখ্যত স্থান পেয়েছে নিশিকান্ত নামক প্রধান চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে। বিধ্বস্ত সমাজব্যবস্থায় কালোবাজারী মহাজনরা সমাজ ও আইনি ব্যবস্থাকে নিজস্বার্থে কুক্ষিগত করার জন্য কেমনভাবে সমাজের প্রতিনিধিসুলভ তকমাটি লাগিয়ে দিব্যি ভালোমানুষের মতন স্বচ্ছন্দ্য জীবনযাপন করেন। নিশিকান্ত কর্মকারের তকমা অনেক, যেমন- তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি, ব্যবসায়ী, অর্থলিপ্সু আবার চোরাকারবারীও। ব্যবসায়ী বলতে আড়তদাড়। মানুষটি নির্দয়, ধূর্ত ও অসৎ। নানান কারবারের সঙ্গে যুক্ত ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি ও ব্যবসায়ী মানুষটির ধনদৌলতও নিশিকান্তর ঘরে স্ফীতকায়। বিগত যৌবন বৈষ্ণবকুলতিলক নিশিকান্ত ডাকাতির মালই শুধু কেনে না; ডাকাতদের রক্ষকও বটে। ইব্রাহিম দারোগাকে মোটা টাকা ঘুষ দেবার পাশাপাশি বিশাখা নামের মেয়েটিকে নিয়োগ করেছে দারোগার জন্য। বিধ্বস্ত সমাজ সভ্যতায় অন্ধকার পথে দেবদাসী বিশাখার হারিয়ে যাওয়া এক অর্থে অবক্ষয়িত সমাজ ও অবমূল্যায়নের পথকেই নির্দেশ করে। এই সব দিক থেকে বিচার করলে নক্রচরিত গল্পটিকে বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ের একটি বাস্তব অবক্ষয়িত সমাজের দলিলও বলা চলে।

'দুঃশাসন' গল্পটি 'দুঃশাসন' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত। দুঃশাসন গল্পটি এই গ্রন্থের প্রথমেই স্থান পেয়েছে। গল্প সংকলনটির প্রকাশকাল-১৯৫২। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্রেক্ষিতে বস্ত্রসংকটকে মূল বিষয় করে লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এ গল্পটি লেখা হলেও মহাভারতের 'দুঃশাসন' নির্লজ্জ পাশবিক চরিত্রটিকে টেনে এনে এক প্রতীকী বঞ্চনা রেখেছেন। গল্পের ভেতরে লেখক বস্ত্রব্যবসায়ী দেবীদাসকে দুঃশাসনের প্রতিভূরূপে উপস্থাপিত করেছেন। এ গল্পের মাদকতা এখানে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষিতে সমাজে বস্ত্রসংকটের পূর্ণ সুযোগ নেয় স্বার্থপর লোভী ঝানু বস্ত্র-ব্যবসায়ী দেবীদাস। অভাবী লোক বাড়ির মেয়েদের ইজ্জত আব্রু বাঁচাতে দেবীদাসের পায়ে পড়লেও পাষন্ড ব্যবসায়ী একটি কাপড় ও দেয় না। এগল্পের অন্তিম এক নাটকীয় চমক এনেছেন লেখক। দারোগাবাবুর উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছে যাত্রার আসর। পৌরাণিক যাত্রাপালা। মামা শকুনিকে দুর্যোধনের পাশাখেলার মতো জয়ের সর্বনাশের জন্য দায়ী কারা, দ্রৌপদীর অযত্ন অবিন্যস্ত রুক্ষ চুলে সর্বাঙ্গ ঢেকে শপথ বাক্য শোনানো এবং অর্জুনের লজ্জারাঙা নতমুখে দীনভাব ও ভীমসেনের দুঃশাসনের বুকের রক্ত দিয়ে পাঞ্চালীর বেণীবন্ধনের সংকল্প-এইসব বিষয়ঘটনা নিয়ে যাত্রার আসর নিপুন দক্ষ অভিনয়ে গমগম করে ওঠে। যাত্রাচলাকালীন গৌরীদাসের মনে হয়- 'সারা পৃথিবী জুড়েই যেন দৌপদীর মতো আর্তনাদ উঠছে আজকে'। পৌরাণিক দুঃশাসনের প্রতীক প্রয়োগও 'দুঃশাসন' গল্পটিকে অর্থবহ করে তুলেছে। 'দুঃশাসন' গল্পে 'দুঃশাসন' অর্থাৎ অপশাসনের নামের মধ্যে রূপকাশ্রয়ীর ব্যাপারটি রয়েছে তাকে অস্বীকার করা যায় না। দুঃশাসনেরা যুগে যুগে থেকে নানান ছদ্মবেশে নানান রূপে ভূমিকা নিয়েছে। যার জলন্ত উদাহরণ দেবীদাস ও শচীকান্তর মতন মানুষেরা। সমাজকে যারা প্রত্যহ বস্ত্রহরণ করে নগ্ন করে দিচ্ছে। 'দুঃশাসন' নামকরণ তাই যথার্থ ও তাৎপর্যপূর্ণ।

'টোপ' গল্পটি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি অন্যতম জনপ্রিয় গল্প। রামগঙ্গোপাধ্যায়ের একটি অন্যতম জনপ্রিয় গল্প। রামগঙ্গা এস্টেটের শিকার বিলাসী রাজাবাহাদুর এন.আর. চৌধুরী ও তাঁর পার্শ্বচরিত্ররা কথক আর অরণ্যের গভীর ভয়াল পরিবেশ-এসব নিয়েই এ গল্পের পরিবেশ রচিত হয়। এ গল্পের

বাঁধুনি আঁটসাঁটো নয়৷ তবে এ গল্পের শেষমেষ একটি অনুপম সৌন্দর্যবোধের গল্প হয়ে ফুটে উঠেছে৷ তরাই এক ঘন জঙ্গলময় পরিবেশকে অনুপম রসমাধুর্যে বর্ণনা করেছেন কথক৷ লেখক ওরফে কখক এ গল্পে রাজাবাহাদুরের ভয়ঙ্কর অমানবিক সাম্ন্তত্মতান্ত্রিক হিংস্রতার জলন্ত্ম প্রতিমূর্তি৷

রাজাবাহাদুরের শিকারের সঙ্গী লেখকও অভিজাত্য, অহমিকার প্রতিমূর্তি রাজাবাহাদুর বড় হাতের বাঘ শিকারের জন্য টোপ হিসাবে ব্যবহার করেছেন হিন্দুস্থানি কিশোর সন্ত্মান৷ আরএ ঘটনার আটমাস বাদে মার্সেলে যে জুতো জোড়া আসে, তা নিহত ওই বাঘের চামড়া দিয়েই তৈরি৷ গল্প এখানেই শেষ হয়ে যায়৷

সামন্ত্রতান্ত্রিক প্রভুরা মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষকে কিভাবে নিজেদের কাজে ব্যবহার করেন- সে চিত্র লেখক গল্পটিকে স্প ষ্ট করেছেন গল্পের কথককে বাঘের চামড়ার জুতো উপহার দিয়েও তেমনি স্প ষ্ট করে তুলে ধরেছেন কায়েমী স্বার্থ চরিতার্থতার নিমিত্তে কীভাবে কৌশলে ‘টোপ’ তৈরি করেন মানবশিশুর বলিদানের মাধ্যমে৷ কাজেই গল্পের নামটি যে ব্যঞ্জনাবহুল ও টোপ নামটি যে যথাযথ তা বলার অপেক্ষা রাখে না৷

‘উস্ত্মাদ মেহেরো খাঁ’ গল্পটি ১৯৪৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিকায় রচিত একটি গল্প৷ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কিভাবে মানুষকে এক পৈশাচিক বিবেকহীন পথে ঠেলে দিতে পারে তারই এক নিপুন চিত্র তুলে ধরেছেন এ গল্পে৷ মেহেরো খাঁ একজন সঙ্গীত শিল্পী৷ উস্ত্মাদ মেহেরো খাঁ৷ শঙ্করের বাবা জগন্নাথ চৌধুরী পনেরো বছর আগে ওস্ত্মাদজি মেহেরো খাঁকে নিজের গৃহে সমাদরে বরণ করে নিয়ে আসেন৷ ১৯৪৬-এ হিন্দুমুসলমানের এক ভয়ঙ্কর দাঙ্গায় দিন বদল ঘটে৷ অস্থির সময়৷ জগন্নাথ চৌধুরী মারা গেলেন৷ এখন চতুর্থপুরুষের যুগ চলছে৷ পুরনো সংস্কৃতির পালাবদল ঘটেছে৷ বদলেছে মূল্যবোধ৷ জগন্নাথ চৌধুরীর মৃত্যুর পর কলকাতার বাড়িতে অবস্থানকালে শঙ্করের আধুনিক গানের প্রতি ভালোলাগা অনুভব করেন ওস্ত্মাদজি৷ ৪৬-এর দাঙ্গায় পারস্প ারিক সম্প্রীতি ভেঙে যেতে থাকে মানুষের মধ্যে৷ শঙ্করও এই ভাবনা থেকে মুক্ত করতে পারে না নিজেকে৷ তাই ‘উস্ত্মাদ’ পরিণত হন বিভীষণে’৷ “উস্ত্মাদজী’ গুনী নন, উস্ত্মাদজী আর কিছু নন, তিনি মুসলমান এবং ফলে তাকে বিশ্বাস করা চলে না” শঙ্কর ভুলে যায়, সে ভুলে যায় শিল্পীর কোনোজাত নেই তাই শঙ্কর নির্দ্ধিধায় বলতে পারে-আপনি বেইমান, আমার বাড়িতে বেইমানের জায়গা নেই৷ ফলে ‘মিঞা কি টোড়ী’-র কিংবদন্ত্মীগুনী শিল্পী উস্ত্মাদ মেহেরো খাঁ-র জীবনপ্রদীপও শেষমেশ নিভে গেল কলকাতার পথে উন্মত্ত দাঙ্গায়৷ তবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীভৎসতায় মৃত্যু ঘটলেও শিল্পী যে বেঁচে থাকে তাঁর শিল্পে এর উজ্জ্বল উদাহরণ লেখক রেখেছেন মেহেরো খাঁ-র উত্তরাধিকারের মাধ্যমে৷ শঙ্করের স্ত্রী রমার মধ্যে লেখক এই অনুভূতির চিত্রটি তুলে ধরেছেন৷ ‘বেটি রমাকে তিনি শঙ্করের অলক্ষ্যে উজার করে দিয়েছেন তাঁর সঙ্গীতরত্ন৷ লেখকগল্পের শেষে একথাও জানিয়েছেন- “...... বেশিদিন লুকোচুরি তো চলবে না শঙ্করের কাছে৷ একদিন বুঝতে পারবে শঙ্কর-একদিন জানতে পারবে, টৌড়ী রাগিনীর পাঠ্য শেষ না করেও কতভালো সেতার শিখছে রমা৷ নিভৃত অন্ধকার ঘরে তার সেই একনিষ্ঠ সাধনা, তার গুরুর আর্শীবাদ সার্থক হয়েছে৷”

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মানুষকে পশুতে পরিণত করলেও, সেটাই সত্য কথা নয়৷ তবে শিল্পীর জীবন গেলেও শিল্পের অপমৃত্যু না ঘটিয়ে লেখক এ গল্পে, প্রকারান্ত্মরে মানুষের চিরন্ত্মন জয়ের কথাই কিন্তু আকারে ইঙ্গিতে বোঝাতে চেয়েছেন৷ লেখকের শৈল্পনৈপুণ্যের যে পরিচয় মেলে- তা অসাধারণ৷

‘পুস্করা’- এটি নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি উলে-খযোগ্য গল্প৷ মন্বন্ত্মরের প্রেক্ষিতে যে মহামারী একসময় গ্রামবাংলায় চেপে বসে তারই এক বীভৎস এ গল্পে ধরা পড়েছে৷ বলা ভালো, পুষ্করা গল্পে মহামারীর সার্থক চিত্র রূপাঙ্কিত করেছেন লেখক৷ ১৩৫০ এর মন্বন্ত্মরের সময়ে মজুতদারেরা সুযোগ বুঝে অধিক মুনাফার আশায় গ্রামবাংলাকে যেভাবে শোষন করেছেন- তাকেই এগল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক৷ মারী ও মড়ক নিয়েই যে নীলকণ্ঠের বিষপানের মতন দুর্বিষহ জীবন নিয়েই যে সাধারণ মানুষকে সময়স্রোতের টানে চলতে হয়-তা সুস্প ষ্টভাবে বলেছেন লেখক৷ শুক্লা চতুর্দশীর রাতে মহাশ্মশানের বুকে দেবী কালীকে প্রসন্ন করতে পন্ডিত-পুরোহিত, তর্করত্ন পুজোয় বসেন৷ কলেরার মড়ক থেকে গ্রামবাসী রক্ষা করতেই দেবীকে আহ্বান জানিয়েছেন তর্করত্ন৷ যতরাত বাড়ে, ততই উদ্বিগ্ন বাড়তে থাকে৷ দেবী যদি শিবাভোগ গ্রহণ না করেন তা হলে অনিবার্য পুষ্করা৷ গ্রাম নয়, সমস্ত্ম দেশ শ্মশানকালীর কোপে শ্মশান হয়ে যাবে৷ পরম আনন্দে তর্করত্ন লক্ষ্য করেন “অন্ধকারের মধ্যেদৃষ্টি নিশাচরের মতো তীক্ষ্নতা পেয়েছে, স্প ষ্ট দেখা যাচ্ছে এক মাথা ঝাঁকড়া চুল, কুচকুচে কালোগায়ের রঙ, অর্ধনগ্ন নারীমূর্তি৷ তার দাঁতের চাপে হাড়গুলো মড়মড় করে ভেঙে যাচ্ছে”-

গলা ফাটিয়ে চিৎকার করেন তর্করত্ন "ওরে বাজা, বাজা! আর ভয় নেই, দেবী নিজে এসেছিলেন, তাঁর ভোগ নিজেই গ্রহণ করে গেছেন|"

লেখক নিজেই গল্পের শেষে দেবীর আসল স্বরূপের প্রকাশ ঘটিয়েছেন- "তাঁর শ্মশানকালী এসেছিল ওই ডোমপাড়ার পাগলিটার রূপ ধরেই....... কালীর মতো জিভ মেলে হাঁপাচ্ছে একফোঁটা জলের জন্য|"

মানুষের মুনাফার অধিক প্রত্যাশী মজুতদারদের কারণেই সাধারণ ভুখা থেকে রাক্ষসী ক্ষুধার জ্বালায় অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে যে মারী ও মড়কের কবলে পড়ে বেঘোরে মরতে হয় তা এগল্পে 'শিবাভোগ' গ্রহণের ভেতর দিয়ে পাগলিনী ডোমবধূর আসন্ন মৃত্যুর ছায়াচিত্রে লেখক তুলে ধরেছেন পাঠকের সামনে| অধ্যাপিকা- প্রাবন্ধিক শিপ্রা দে'র ভাষায়- "পুষ্করায় একদিকে মানুষের অন্ধসংস্কার উপস্থিত হয়েছে, অন্যদিকে যুদ্ধের সময় মানুষের খাদ্যহীনতার চরম রূপ ধরা পড়েছে|"

'ভাঙা চশমা' গল্পটি অবক্ষয়িত মূল্যবোধের বিপর্যয়ের কাহিনি| নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এগল্পটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুদ্ধ-মন্বন্তরের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয়| এ গল্পের নায়ক উচ্চশিক্ষিত| প্রথম শ্রেণির এম.এ.পাশ| বিবাহিত, স্ত্রী অনু| জীবিকার তাগিদে মফস্বলের একশহরে ষাট টাকা বেতনের স্কুল মাষ্টার| দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা কন্ট্রোল আর কালোবাজার| ইনফ্লেশন| উচ্চশিক্ষিত যুবকের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল| যুদ্ধের বাজারে গ্রামে গ্রামে রিলিফের কাজের জন্য সরকার শিক্ষিতদের মধ্যে থেকে সাবডেপুটি গ্রেডের অফিসার নিয়াগ করেন| যদিও চাকরিটা অস্থায়ী| স্কুলের চাকুরি ছেড়ে নতুন কাজে সোৎসাহে যোগ দেন একদা স্কুল শিক্ষক-যুবক| গর্ব আর অহংকারে বুঁদ হয়ে যুবক অনুভব করেন "প্রভুত্বের আস্বাদ নতুন- রক্ত খাওয়া বাঘের মতো|" মাঝে মাঝে নষ্ট্যালজিয়ায় আক্রান্ত হন যুবকটি| স্কুল মাস্টারের নিরীহ সত্যসন্ধ মনটি নিজেকে 'বিরাট প্রহসনের বিদূষক' ভাবতে থাকে| আকস্মিকভাবেই গল্পের পটপরিবর্তন ঘটে| ছেঁড়া পাঞ্জাবি পরণে এক অপ্রকৃতস্থ ভদ্রলোক যুবকের বোধদয় ঘটান| তার দুচোখে আঁটা ভাঙা চশমা| যুবককে উদ্‌ভ্রান্ত মানুষটির প্রশ্ন- "প্রিপোজিশন না পড়লে কি ইংরাজী শেখা যায় ?" খোড়া আটচালার পচা খড় আর গোবরের ভ্যাপসা গন্ধে নায়কের শ্বাসকষ্ট হতে শুরু করে| অথচ এই আটচালা ঘরটি ছিল জনৈক ভদ্রলোকেরী একদা স্কুলবাড়ী| দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে ছাত্ররা পালিয়েছে, না খেতে পেয়ে মরে গেছে| নিজের কাছেই নিজের প্রশ্ন করেছেন- "আমার সারা জীবনের সব স্বপ্ন এমন করে কে শেষ করে দিলে বলতে পারেন|" গল্পের নামকরণও ব্যাঞ্জনাধর্মী| এই শব্দদুটির (ভাঙা, চশমা) মধ্যদিয়ে লেখক অবক্ষয়িত মূল্যবোধের প্রেক্ষিতে দৃষ্টি বিভ্রমের কথাই আমাদের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছেন| জনৈক স্কুলমাস্টারের সঙ্গে পরিচিত হয়ে শিক্ষিত এম.এ. পাশ যুবকেরও ফেলে আসা অতীত শিক্ষক জীবণের স্মরণের মধ্যদিয়ে মানসিক দ্বন্দ্ব ও আত্মসমালোচনা ও ধিক্কারের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে|

'বনতুলসী' গল্পের শুরুতেই লেখকের রসাশ্রিয় বোধের পরিচয় মেলে| বিমলেন্দু'র তৃতীয় কন্যাসন্তান জন্মানোর সংবাদে যেন ঘটেছে প্রেমের নির্বাসন| গল্প কথক রঞ্জন| তার কাছে কবিদের অশরীরী প্রেম ও অতীন্দ্রিয় মিলনের বিশ্বাসটাই বড়| লেখকের মতে- প্রেমের পরিণতিই হচ্ছে পূর্ণগ্রাস- ওর একমাত্র উপমা ভেনাস ফ্লাইট্রোপ| সোপেন হাওয়ার পড়লে অনেক জ্ঞান লাভ করতে পারবে| কিন্তু শুধু মানুষের প্রেম নয়- প্রকৃতির প্রেম ও ওই রকম সর্বগ্রাসা| প্রাবন্ধিক শিপ্রা দে-র মন্তব্য-এ গল্পের প্রেমের ব্যাপারটি সম্পর্কে, বিশেষ করে কাহিনীর ভেতরে দুটি ভাগের কথা এনে- প্রথম ভাগে কৈশারের এক আশ্চর্য কন্যাকে দেখে প্রেমের অনুভূতি, আর দ্বিতীয় ভাগে আছে সাবালক হওয়ার পর শিকারে গিয়ে সেই নারী'র পূর্ণদর্শন এবং প্রকৃতির মধ্যে আত্মবিলোপ| অবাধ প্রকৃতির মধ্যে তার রূপে মুগ্ধ হয়ে হারিয়ে যাওয়া কাব্যিক হলেও তা কথকের মনে আতঙ্ক জাগিয়েছে, প্রকৃতি ভালো, প্রেমও ভালো| কিন্তু প্রকৃতিপ্রেমে আত্মবিলোপ এক চরম অভিজ্ঞতা| যে প্রেম গৃহকোনে মঙ্গলদীপ জ্বেলে সন্তানের মধ্যে হারানো স্বপ্নকে খুঁজে পায়, সেই গন্ডিবদ্ধ প্রেমই সাধারণত মানুষের কাছে স্বস্তিপ্রদ|" (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প)

'সৈনিক' গল্পটি নারায়ণ বন্দোপাধ্যায়ের লেখা একটি উলে-খযোগ্য গল্প| কুমারদহ গ্রামের জমিদার চন্দ্র চৌধুরী| একসময় মুসলমানদের আক্রমনের ভয়ে দেবীকোটে রাজবংশের কোনো এক রাজা পালিয়ে আসেন| তারই উত্তর পুরুষ পঞ্চাশোর্ধ চন্দ্র চৌধুরী জমিদারির অধীনস্থ প্রজা সাঁওতালরা| পালগ্রামে বসবাসের অনুমতি জমিদারই দিয়েছিলেন| কুমারদহ গ্রামে সাঁওতালরা আসারপূর্বে ছিল একেবারে মৃত| লেখকের ভাষায়-

'মৃত বাংলার অস্থিকঙ্কাল রাশি রাশি ইঁট
কাঁকড়ে ভাঙা জঙ্গল আর মজা নদী'|

চন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গী নীলবাহাদুর, হাতি| একদা আসামের প্রবল পরাক্রা~ন্থ নীলবাহাদুর 'কুনকি'র ছলনায় বন্দী হয়ে রাজা চন্দ্র চৌধুরীর বাহন মাহুতের নির্দেশে রাজার একেবারে বংশবদ হয়ে পড়েছে| চন্দ্র চৌধুরীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইন্দুচৌধুরী নিরুপায় হয়ে জমিদারি দেখাশোনা শুরু করেন| এম.এ. পাশ| ইতিহাসের কৃতিছাত্র|

লালগাঁয়ের টিলা দেখে ইতিহাসের ছাত্র তথা নতুন জমিদার ইন্দ্র চৌধুরীর কেমন যেন বিশ্বাস হয়- ওই টিলার ভিতর নিচে নিশ্চয়ই লুকিয়ে আছে পাহাড়পুরের মতো একটা প্রচ্ছন্ন বিহার বা অন্যকিছু| সাঁওতালদের উৎখাত করার জন্য জমিদারবাবু ব্যবহার করেন বুড়ো হয়ে যাওয়া (অকোজে-জমিদার বাবুর ভাষায়) নীলবাহাদুরকে| তিনদিন অভুক্ত রেখে নীলবাহাদুরকে ছেড়ে দিলে সে সাঁওতালদের চাষ করা ক্ষেতকে তছনছ করে দেয়| সাঁওতালরা তীরবিদ্ধ করে নীলবাহাদুরকে শেষ করে দেয়| হাতিটি বিকট চিৎকার করতে করতে জমিদারবাবুর বেবি অষ্টিন গাড়িটি বিশাল শরীরের চাপে গুড়িয়ে দেয়| চিরবিদায় নেয় নীলবাহাদুর|

এগল্প আসলে প্রাচীন আর নবীনের দ্বন্দ্বের গল্প| বেবি অষ্টিনকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে আসলে প্রকাশ পেয়েছে জমিদারের প্রতি নীলবাহাদুরের তীব্র অবজ্ঞা| এগল্পটি যাথার্থই ব্যাঞ্জনাধর্মী| মানুষই তো ইতিহাস রচনা করে, কাজেই মানুষের বেঁচে থাকাকে অর্থহীন করে কখনই ইতিহাস বড়ো হয়ে উঠতে পারে না| ইন্দ্র চৌধুরী যথার্থই সাম~ন্থতান্ত্রিক প্রতিভুরূপে রচিত হয়েছে| প্রকৃতি এ গল্পের একটা প্রাণবায়ুরূপে হাজির হয়ে গল্পের থিম ও কাহিনীকে যথার্থই প্রাণব~ন্থ করে তুলেছে| শিল্পগুনের দিক থেকেও এ গল্পকে কোনোভাবেই খাটো করা যায় না| এগল্পটি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি উৎকৃষ্ট গল্প|

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা 'জা~ন্থব' গল্পে মানুষ পশু আর প্রকৃতি মিলে এই গল্পের জা~ন্থব জীবনবৃত্তকে সম্পূর্ণ করেছে| প্রকৃতি এগল্পের পরিবেশ রচনায় এক বিশেষ মাত্রা এনেছে| আমাদের পরিচিতি পরিবেশ থেকেও একেবারে স্বতন্ত্র| এই পরিবেশে জীবনের আদিমলীলা নিজেকে অকুণ্ঠভাবে মেলে ধরেছে| এই বিশিষ্ট পরিবেশ যেন এক অদম্য জৈব ক্ষমতাসম্পন্ন| দুর্গম পাহাড়ের কোলে এক পাহাড়ী গ্রামে থাকেন গুম্ফালামা ও তার কুকুর লালু| বিশবছর আগের ছিল তার বিবাহিত জীবন| কালের নিয়মে সমাজ সংসার বিচ্ছিন্ন একমাত্র সঙ্গী এই একা~ন্থ কুকুরটি| দু'দিন ধরে চলা ঝড় বৃষ্টির প্রলয়ে খীদে আর তীব্র শীতে গুহার ভিতরে থাকা মানুষ আর কুকুরে শুরু হয় জীবন সংগ্রাম, প্রতিদ্বন্দ্বিতা| গুম্ফালামা কুকুরটিকে পাহাড়ের ঢালুতে ছুঁড়ে গড়িয়ে দেয়| কিছুক্ষণ পরেই দুর্যোগ কেটে গেলে অনুতপ্ত গুম্ফালামা লালুকে খুঁজতে বের হলে একদল জঙ্গীকুকুর তাকে (গুম্ফালামা) খেয়ে ফেলে|

প্রতিকূল ও ভয়ঙ্কর এই প্রাকৃতিক রাজ্যে যে জীবন প্রতিফলিত হয়, তা সংঘাতময় জা~ন্থব জীবন| এই জীবনে আছে প্রেম, বিশ্বাসঘাতকতা, সুখ, বিরহ, ভালোবাসা ও হিংস্রতা, আত্মীয়তা ও নির্মম প্রতিশোধ, আদিম জীবনলীলায় টিকে থাকার প্রথমতম শর্তে মানুষ, পশু এবং প্রকৃতির মধ্যে তীব্রদ্বন্দ্ব| এগল্পে শব্দ এবং ভাষারীতিতে কোথাও কোথাও কাব্যিকতার স্পর্শ আছে| গল্পের সূচনাতেই প্রাকৃতিক পটভূমি বর্ণনায় আছে কিছু বর্ণময় ছবি| 'দেওঘর', 'নগধিরাজ', 'সন্ধার ম্~ানিমা', 'উতরোল' ইত্যাদি শব্দে প্রয়োগ কাব্যিক এবং রোমান্টিক আমেজ নিয়ে আসে| নিরাসক্ত, নির্মোহ বিবৃতির ভঙ্গিতে এই গল্পের অবতারণা করেছেন গল্পকার| জা~ন্থব জীবনলীলার তিনি যেন নেপথ্য দর্শক মাত্র| প্রকৃতি ও মানুষ মিলে এখানে যে আদিম জীবন লীলা প্রদর্শন করেছে, তা পুরোপুরিই জা~ন্থব| এ গল্পের নামকরণের সার্থকতা এখানেই|

'ফলশ্রুতি' গল্পের কথক কলকাতার ঘরকুনো মানুষ| তিনি সাহিত্যিকও বটে| অল্পদিনের ছুটি পেয়ে স্ত্রী অনুর সঙ্গে বিহারের রাজগীর নালন্দায় বেড়াতে বেরোন| বিকেলে রাজগীর ঘুরে পাটনায় ফিরতে চেয়েছিলেন কথক ওরফে লেখক|কিন্তু রাজগীরে ট্রেন না যাওয়ায় রাজগীরে থাকতে বাধ্য হন| তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন রহস্যময়ী নারী নিরু এবং তার মা| অতিথি হিসাবে কথকও তার স্ত্রী অনু যথেষ্ট আপ্যায়িত হন ওদের কাছে থেকে| কিন্তু নিরুদের বাড়ি থেকে ফেরার পর ওদের সম্পর্কে কথকের স্ত্রী কুশ্রী ম~ন্থব্য করেন শুধুতাই-ই নয়, ওরা যে ভদ্রলোক নয়- এই বিচার করেই ওদের সম্পর্কে সমস্~থ রহস্য এবং ওদের প্রতি যাবতীয় কৃতজ্ঞতাকে মুছে দিয়েছেন|

'ফলশ্রুতি' গল্পটি উত্তম পুরুষের জবানিতে বর্ণিত হয়েছে| কথক ও তার স্ত্রীর আশ্রয় দাতা নিরু-এ গল্পের কিছু রহস্যময়ী চরিত্র| কারুর পরিচয়ে অস্পষ্টতা থাকলে তার প্রতি প্রশ্ন জাগে- এতে কোনো অ-স্বাভাবিকতা নেই| অন্যদিক থেকে বলতে গেলে, নীতি বা ঔচিত্যের দিক থেকে তা কতখানি সঙ্গত সে অন্যপ্রসঙ্গ নিরু বিবাহিত- বিবাহের কোনো চিহ্ন নেই| নিরু মায়ের সঙ্গে থাকে, পুরুষ অভিভাবক ছাড়া| এই গল্পের অন্যতম চরিত্র এবং তাঁরই দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতার নিরিখে গল্পটি বর্ণিত

হলেও গল্পের যাবতীয় কৌতুহল ও আকর্ষণ গড়ে ওঠে নিরু নামক রহস্যময়ী নারীকে কেন্দ্র করে|

এগল্পে উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার গল্পের আবহকে উপযুক্ত আবহ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে| অন্ধকার, অনিশ্চিত, সংশয়, দৈববাণী, মন্ত্রমুগ্ধ, রহস্য, অপরিচিত, অলৌকিক, অচেতন ইত্যাদি|

নিরুর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে কুশ্রী মন্তব্য অত্যন্ত স্বাভাবিক| লেখকের ভাষায় 'ভদ্রলোকের পক্ষেই স্বাভাবিক|' কথকের আত্মভর্ৎসনা ও আত্মবিশে-ষনই আমাদের ভাবানাকে সচকিত করে| পাঠকের মূল্যবোধের চেতনার তারে স্পর্শ লাগে| গল্পের কথক চরিত্রের স্বপ্নবিলাশ দিনের আলোয় শেষ হয়ে গেলেও পাঠকের মনে তার রেশ ফুরোয় না|

'ইতিহাস' গল্পটি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সুখপাঠ্য গল্প| এগল্পে গৌড়বঙ্গ সম্পর্কে লেখকের আন্তরিক গর্ব ও ভালোবাসা ব্যক্ত হয়েছে| গল্পের মুখ্য চরিত্র অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অমরেশের মাধ্যমে| গল্পের শুরুতেই দেখি লেখক আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অমরেশের মাধ্যমে সত্য সন্ধানী দৃষ্টির কথা|

লেখক নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়ের গৌড়বঙ্গের প্রতি আন্তরিক গর্ব ও ভালোবাসা হৃদয়ে জমাট হওয়ার জন্যই বিয়ালি-শের আগস্ট- আন্দোলনের মুহুর্তকালে তাঁর অন্তরের স্মৃতি অর্পণে গৌড়বঙ্গের তথা বাঙালি জীবন ধারার শৌর্য ও বীর্যের অভাববোধ ও সমাজজীবনের শ্রীহীনতার জ্বালা ও যন্ত্রনা ঝড়ে পড়েছে| যে গৌড়বঙ্গের ঐতিহ্য একদিন আকাশচুম্বী ছিল- যেসব গৌড়বঙ্গের রাজধিরাজরা বীরত্বের মহিমান্বিত রূপ প্রকাশ করেছিল- সে রূপের ঐতিহ্য বা বীরত্ব কি আমরা অন্তরে লালিত করছি ? মনে রেখেছি ?- এসব প্রশ্ন যেন লেখককে এক সমগ্র গৌড়বঙ্গের বর্ত্তমান উত্তরাধিকার রূপে তথা বাঙালী জীবনের ত্রুটি আত্মবীক্ষনের দর্পনরূপে আমাদের কাছে হাজির করেছেন অতীত চারিতার ইতিহাস দর্পণে|

প্রাবন্ধিক শিপ্রা দে তাঁর 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ছোটগল্প' গ্রন্থে বলেছেন 'ইতিহাস' গল্পটির বিচার করতে বসে গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্রের মাধ্যমে দেখিয়েছেন- 'একদিকে মৃত অতীতের তথ্যস্তুপ, অন্যদিকে চলমান জীবনের দ্বন্দ্বমুখরতা গল্পটির প্রাণবিন্দু হতে পারত| নিভৃত ইতিহাস সাধনা আর চলিষ্ণু রাজনৈতিক জীবনের অংশভাগী হওয়া দুইই ইতিহাস|"

আসলে ইতিহাস যে যুদ্ধবাজ মানুষের সংগ্রামী চেতনার ভেতর দিয়ে গড়ে ওঠে বাস্তবের ঘাটভূমিতেই এ সত্য লেখক আমাদের কাছে তুলে ধরতেই যে অতীত ইতিহাসকে এগল্পের সামনে এনেছেন বলা যেতে পারে| নতুন ইতিহাসতো গড়ে ওঠে সময় পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে|

এগল্পে কথক অমরেশের ঈপ্সিত আকাঙ্খার মধ্যে রাখী বন্ধনের কথা লেখকের মূল ভাবনাকেই ইঙ্গিত করছে না কি ? গল্পটির মধ্যে নাটকীয়তা মাঝে মধ্যে আসার জন্য গল্পটির শিল্পরস ক্ষুন্ন হয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করলেও আমার কিন্তু অন্য কথা মনে হয়েছে, নাটকীয়তাই এই গল্পটিকে যথার্থ রসময় ও সুখপাঠ্য করে তুলেছে এবং পাঠকের বোধ ও বুদ্ধির ভেতরে একটা চৈতন্যের ধাক্কা দিয়েছে|

হাসি-আনন্দ, অভিমান-কলহে উচ্ছ্বাসিত নব নবীন দম্পত্তি স্টিমারে করে চলেছে| কেবিনের সামনের চেয়ারে বসে ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়তে থাকা স্কুল মিসট্রেস-করূপা ইন্দিরা চৌধুরীর চোখ বারবার সেদিকে চলে যাচ্ছিল| তার স্টোভে পোড়া কুৎসিত মুখ, নিজের ব্যর্থ শূণ্য জীবন- তাই অকারণ একটা আক্রোশ অনুভব করতে থাকে| তরুন দম্পত্তি বিভাস ও ইলার সঙ্গে আলাপ হয়| ইন্দিরা তাদের একটি মেয়ের ব্যর্থ জীবনের গল্প শুরু করে| বানানো গল্পকে দম্পত্তি যুগল ভেবে নেয় ইন্দিরা চৌধুরীর নিজের জীবনের গল্প| গল্পের বিষয়- লক্ষ্মী ও সত্যেনের একদামুখী দাম্পত্য জীবন নষ্ট হয়ে যাওয়ার কাহিনি| সত্যেন প-ারিসিও যক্ষ্মা রোগে মারা যায়| ডাক্তার বিভাস আমোদিত ভাবে সংসার ও শেষে লক্ষ্মীর দিকে হাত বাড়ালে লক্ষ্মী প্রত্যাখান করে| অপমানিত বিভাস প্রতিশোধ নেয় অন্যভাবে| লক্ষ্মীর হাম হলে ডাক্তারের দেওয়া ঔষধ ওমওখ দগদগে ঘা বেরিয়ে যায় সারামুখে| গল্পটি এখানেই শেষ করে ইন্দিরা চৌধুরী চলে গেলেও রেখে যায় ইলার মনে অবিশ্বাসের আগুন| তার স্বামীও যে বিভাস| ডাক্তার|

এ গল্পে দুর্ঘটনা বহুবার ঘটেছে এবং একাধিক ব্যঞ্জনা নিয়ে এসেছে| স্টোভ দুর্ঘটনায় ইন্দিরা চৌধুরীর মুখপুড়ে যায়| ইন্দিরার শোনানো গল্পে ডাক্তারের ঔষধ ব্যবহারে লক্ষ্মীর মুখে দগদগে ঘা হয়ে যায়| সর্বোপরি স্টিমার যাত্রায় ইন্দিরার সঙ্গে বিভাস ও ইলার আলাপ হওয়াটাই একটা দুর্ঘটনা| কেননা ইন্দিরা তাদের জীবনে অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছে| সেই হিসেবে এগল্পের নামকরণ সার্থক| তবে ইন্দিরা চৌধুরী লক্ষ্মীর নামে যে গল্পটি ইলাকেও বিভাসকে করেছে তা কেবল বানিয়ে বলা মাত্র| ঈর্ষাকাতর| তার (ইন্দ্রানী) মুখ পুড়েছিল স্টোভ দুর্ঘটনায়| এর ফলে ছোট গল্পের রেশ রেখে যাওয়া দিগন্তকারী রহস্যময়তা যেন কিছুটা ক্ষুন্ন হয়|

বাংলা কথাসাহিত্যের ধারাবাহিকতায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এক অবিস্মরণীয় কথাকার। তিনি ছোটগল্পের রূপ ও রীতি নিয়ে মূল্যবান তত্ত্বালোচনা করেছেন। ছোটগল্পের সীমারেখাটিকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে এবং সেই সীমানাকে বহুদূর প্রসারিত করতে ছোটগল্প রচনা নিয়ে তিনি বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর গল্পগুলির পর্যালোচনায় এই বিষয়টি বিশেষভাবে অনুভূত হয়। গল্পের বিষয় নিয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুসন্ধান ও পরীক্ষার উৎসাহ যেমন সীমাহীন, গল্পের রূপ নিয়েও তাঁর আগ্রহ অনুরূপ। শিল্পী তাঁর বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টি ও বিশে-ষণের নিপুন কৃৎকৌশল দিয়ে তার প্রায় সব দিককেই আবিষ্কার করতে চেয়েছেন- ছুঁতে চেয়েছেন একই সঙ্গে। মানবজীবনকে ধরতে চেয়েছেন সামগ্রিকভাবে। শ্রেষ্ঠ শিল্পী মাত্রই পূর্ণতার সন্ধানী। খ্যাপার ‘পরশ পাথর’ খোঁজার মতো তিনিও সন্ধান করে ফেরেন পূর্ণতার। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর অজস্র ছোটগল্পের টুকরো টুকরো আলোককণা দিয়ে সেই পূর্ণতাকেই মূর্ত করতে চেয়েছেন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা ছোটগল্পের বিরাট ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়েছেন। বিশ্ব সাহিত্যের অভিনয়ে তাঁর স্বচ্ছন্দ যাতায়াত ছিল। ফলে ছোটগল্পের রূপ নির্মাণে তিনি বিচিত্র কলাকৌশল প্রদর্শণ করেছেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন নানাভাবে। প্রচলিত রূপের প্রয়োগ যেমন রয়েছে, তেমনি নতুন নতুন রূপ সৃষ্টিও করেছেন। গবেষকের তত্ত্বাভাবনাকে যেমন গ্রন্থিত করায় নয়, তাঁর তত্ত্বানির্মানকে প্রয়োগও করেছেন নিজের গল্পে।

কথাসাহিত্যিক নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়কে ঘিরে যে বিচিত্র চলমান জীবন অভিজ্ঞতার আলোকে যার প্রতিফলন ঘটেছে সাহিত্যে, তা দেশকাল নিরপেক্ষ নয়। শিল্পীর পূর্ণাঙ্গ মানসলোকে দেশ এবং কাল চিরদিন উপকরণ জুগিয়ে চলে। ছোটগল্পের সীমিত পরিসরেও সমকালীন জগৎ ও জীবনের বহুমুখী জটিল বিন্যাসের সার্থক প্রতিফলন ঘটে। নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায় একজন সময়ও শিল্প সচেতন ছোটগল্পকার। দেশের ও বিশ্বের ঘটনাবলী এবং মানবজীবনে তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিঘাতকেই চিত্রিত করতে চেয়েছেন ছোটগল্পে। লেখকের জীবনকাল বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় থেকে সপ্তম দশম পর্যন্ত ব্যপ্ত। আনুজাতিক ক্ষেত্রে উলে-খযোগ্য রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, দেশীয় রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক পরিচয়, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পকলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নতুনত্ব, আন্তর্জাতিক সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের সমকালীন রূপকে ছোটগল্পের প্রেক্ষাপট হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

‘সাহিত্যে ছোটগল্প’ গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে ‘নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়’ ছোটগল্প লেখকের ব্যক্তিত্বের প্রতিফলনের কথা বলেছেন। ছোটগল্প হচ্ছে গল্পকারের‘চবৎভবপঃ ঙঢ়ঢ়ড়ৎঁঃহরঃু ঃড় চৎড়লবপঃ যরসংবষভচ আসলে প্রত্যেকটি গল্পের নায়ক-নায়িকা বা পার্শ্বচরিত্র লেখকেরই বহুপদী’ অভিব্যক্তি ছাড়া কিছু নয়।’ লেখকের জীবন, মন তাঁর লেখার মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়। সুতরাং সৃষ্টিকে জানা ও বোঝার সঙ্গে সঙ্গে স্রষ্টার জীবনকে কিছুটা মিলিয়ে দেখলে সাহিত্য আলোচনা যেন অনেকটাই পূর্ণতা পায়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবন ও মনের কয়েকটি প্রসঙ্গ তাঁর সাহিত্য, বিশেষত ছোটগল্পে বার বার ছায়া ফেলেছে। যে কোনো সাহিত্যিকের ক্ষেত্রেই একথা হয়তো সত্য যে, পরিণত একজন লেখক যা কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, পরবর্তী সমগ্র জীবন জুড়ে সেই অভিজ্ঞতার ভান্ডার থেকে রসদ সংগ্রহ করে তাঁর সৃস্টি প্রবাহকে পুষ্ট করেন। শৈশব-কৈশোর কাটানো উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ন উদার প্রকৃতি তার নিসর্গ সৌন্দর্য, তার নদী মাঠ, জঙ্গল বারে বারে ফিরে এসেছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে। পরাধীন ভারতে জন্মে খুব ছোটবেলা থেকেই তাঁর স্বদেশপ্রীতি গড়ে উঠেছিল, যোগ দিয়েছিলেন রাজনীতিতে। তাঁর জনকল্যাণকামী চেতনা উৎসারিত হয়ে একের পর এক ছোটগল্প জন্ম দিয়েছে। মানবতার স্বপক্ষে দাঁড়িয়ে আজীবন সাহিত্য রচনা করে গেছেন তিনি। বরাবর একটি কবিমন ছিল সাহিত্যিক নারায়ণের। কবিতা রচনা দিয়েই তাঁর সাহিত্যজীবন শুরু। পরে কথাসাহিত্যে পুরোপুরি চলে বিচ্ছিন্নভাবে কখনো কখনো কবিতা ও রচনা করেছেন। তবে ভেতরের একটি স্পর্শকাতর কবিমন বারে বারে এসে উঁকি দিয়েছে তাঁর গল্প উপন্যাস। গল্পের নিসর্গ প্রকৃতির বর্ণনায়, প্রেমের ভাবপ্রকাশে সেই কবিমনটির পরিচয় মেলে। গল্পের ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্র কবিপ্রাণের স্পর্শ অনুভূত হয়। শিক্ষকতা কে শুধু পেশা নয়, আদর্শগত ভাবে গ্রহণ করেছিলেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অধ্যাপনা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। নিজস্ব ব্যক্তি জীবনের ছাপ নানাভাবে বহু জায়গায় তাঁর রচনাতে স্থান পেয়েছে।

ছোটগল্পের একজন সার্থক শিল্পী নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে, আমাদের স্বভাবতই মনে জাগে যে, বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের স্থানটি একটি উচ্চ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত। প্রায় শতাব্দীব্যাপী সময়

বাংলা ছোটগল্পের উদ্ভব, বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার ইতিহাস| বিচিত্র বিষয় ও রূপের সমাহারে তার জগৎ ক্রমশ প্রসারিত হয়েছে| বহুমুখী বিষয় চয়নে কিংবা গল্পের প্রকরণ সৃষ্টিতে নারায়ণ তাঁর পূর্বসূরীদের অনুসরন করেছেন| বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, গণআন্দোলন, দেশভাগ, স্বাধীনতা, উদ্বাস্তুসমস্যা, অর্থনৈতিক সংকট, রাজনৈতিক অস্থিরতা ইত্যাদি বিষয়গুলি প্রত্যক্ষভাবে বারে বারে এসেছে গল্পে| পরবর্তীকালে রীতি বদল নিয়ে অনেক রদবদল নিয়ে অনেক আন্দোলন দেখা গেছে| ছোটগল্প নিয়ে গবেষণায় ছোটগল্পের ভবিষ্যত নিয়ে গভীর চিন্তা করেছেন নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়| আধুনিক ছোটগল্পের আঙ্গিকের বৈপরিক রূপান্তর তাঁর গল্পেও প্রভাব বিস্তার করেছে| ঘটনাহীন ‘মুহূর্ত-বিলাস’, ‘প্রতীতিজাত একমুখী ‘ইঙ্গিতধর্মিতা’ নিয়ে তাঁর কয়েকটি গল্প থাকলেও ঘটনা যে ‘গল্পের মেরুদন্ড’ তা তিনি স্বীকার করেছেন| তাই চমকপ্রদ ঘটনা, পূর্ণায়ত চরিত্র, নিটোল কাহিনীবৃত্ত নিয়েই তাঁর প্রায় বেশির ভাগ গল্প রচিত হয়েছে|

সাহিত্যিক নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায় সারাজীবনে ছোটগল্প লিখেছেন অনেক| তাঁর রচনা অমরত্ব লাভ করবে কি করবে না সেটা বড়ো কথা নয়, তবে এই গল্পগুলির মধ্যেই আমরা স্রষ্টার ব্যক্তিত্বকে চিনে নিতে পারবো| বহু বিচিত্র লেখনীর অধিকারী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্যের যুদ্ধ কক্ষে প্রবেশ করতে পারি- একমাত্র তাঁর ছোটগল্প রচনার হাতধরে| বাস্তববাদী দৃষ্টি দিয়ে জীবনগত পারিপার্শ্বের সত্যনিষ্ঠ উপস্থাপনা করেছেন তাঁর রচনায়| মানবতাবাদ অটুট আস্থা রেখে মাটি ও মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা ব্যক্ত করেছেন| তাই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রচনায় তাঁর ক্রোধ, অভিমান, গর্ব, ভালোবাসা ইত্যাদি আবেগ ঝরে পড়েছে|

বরাবর একটি কবি মন ছিল নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের| গল্পের মধ্যেও তাঁর সেই কবিপ্রকৃতি বারে বারে প্রকাশ্য হয়েছে| নাট্যধর্ম ও যে তাঁর বিশেষ আগ্রহের, গল্পের মধ্যে তাঁরও পরিচয় পাওয়া যায়| সময়ের ঘাত প্রতিঘাতে বিপর্যস্ত বিশ্বাস, আদর্শ, মানবিক মূল্যবোধের অবনমন ঘটলেও তিনি সেগুলির প্রতি আস্থা হারাননি| শিল্পরূপের কিছুক্ষেত্রেও এমনি তাঁর অটল বিশ্বাস ছিল| তিনি মনে করতেন সাধারণ পাঠক গল্প খোঁজে| নিটোল গল্প রচনায় তাই ঝোঁক ছিল| কিছু কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করলেও ছোটগল্পে ঘটনাকে বর্জন করতে চাননি| সমারসেট ম্যম মনে করতেন, আদি অন্ত্যযুগ সুগঠিত একটি গল্পপাঠককে তৃপ্ত করে| পাঠক ও তাঁদের জিজ্ঞাসার উত্তর চান| নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও অনেকটা এরকম ভাবতেন| ‘নতুন সমাজবাদ’ নতুন দিনের আলোর আগমনের কথা বলতে গিয়ে তিনি যে গল্প লেখেন, তা তাঁকে চমকপ্রদ ঘটনা পূর্ণায়ত চরিত্র, নিটোল কাহিনিবৃত্ত নির্মাণে অনুপ্রাণিত করে এবং এধরণের গল্পের সংখ্যা অনেক| ‘সামাজিক দায়িত্ব’ পালন তাঁর লেখনী ধারণের আর একটি কারণ| গল্পের সমাপ্তি নির্মানে ‘চাবুক হাঁকড়ানো’ সমাপ্তি প্রতি তিনি যে পক্ষপাত দেখান, তার সঙ্গে এর একটা যোগ আছে বলে মনে হয়| তবে তথাকথিত চেকভ-রীতির গল্পও তিনি অনেকগুলি লিখেছেন| সবশেষে ছোটগল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কে একথা বলা যায় যে, ছোটগল্পের বিষয় ও রূপের বর্ণময় বৈচিত্র জীবনরসের লীলাকেই প্রকাশ করতে চেয়েছেন|